DAWAHILALLAH | 1441 | 2020 | ISSUE-2

DAWAHILALLAH

সত্যের আলো ছড়িয়ে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য

দাওয়াহ ইলাল্লাহ

دعوة إلى الله

AL-FIRDAWS
আল-ফিরদাউস

DAWAHILALLAH | 1441 | 2020 | ISSUE-2
সত্যের আলো ছড়িয়ে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য
দাওয়াহ ইলাল্লাহ

সূচী

০৩ সম্পাদকীয়
০৪ আল-জিহাদ : ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা পর্ব-২
১১ নেক কাজের তাওফিক একটি অমুল্য নিয়ামত!
১৩ সহিহ হাদিসের আলোকে ইমাম মাহদীর আমলে মুসলমানদের বিজয়, প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি
১৮ ইমাম ছাড়া জিহাদ ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে (দ্বিতীয় পর্ব, গাযওয়ায়ে যি-করদ)
২০ চিঠি ও বার্তা : ক্ষমা করতে শিখুন
২১ মানহায : সংশয় নিরসন - গণতন্ত্র একটি মশওয়ারার মাধ্যম
২২ নতুন সাথীদের জন্য, বিশেষ করে যারা অফ লাইনে কাজ করার ইচ্ছা আছে কিন্তু কোন মাধ্যম পাচ্ছে না।
২৪ শরীয়তের আহকাম : যুদ্ধের ময়দানে উচ্চস্বরে তাকবিরের বিধান
২৬ আলী ইবনুল মাদীনী
২৭ মানবরচিত বিধান দ্বারা ফয়সালাকারী শাসকদের ব্যাপারে ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনী রহ. এর ফতোয়া
২৮ যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে

সম্পাদকীয়

সকল প্রশংসা সেই রব্বুল আলামিনের জন্য যিনি আমাদেরকে ইসলামের মতো পরিপূর্ণ এক দ্বীন তথা জীবন বিধান দান করেছেন। লক্ষ-কোটি দুরুদ ও সালাম সেই নবীউস-সাইফ, নবীউল মালাহিম মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর; যিনি আপন দেহ মোবারকের পবিত্র খুন ঝরিয়ে এই দ্বীনকে ধরণীতে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

প্রিয় পাঠক!

দীর্ঘ কালের মানব রচিত তাগুতী শাসন ব্যবস্থার যাতাকলে পিষ্ট হয়ে মুসলমানরা আজ তাদের হাজার বছরেরও অধিককালের অর্ধ পৃথিবীব্যাপী কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক খেলাফত পরিচালনার সোনালী ইতিহাস ভুলতে বসেছে।

কালের আর্তে যখন থেকে মুসলমানদের তরবারীতে জং ধরতে শুরু করেছে আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার ভোগ বিলাসের প্রতি ঝুঁকতে শুরু করেছে, অলসতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে, শত্রুদের থেকে অসতর্ক হয়ে গেছে। সেই সুযোগে কুফফার শক্তিরা পূর্ণ শক্তি নিয়ে মুসলমান ও তাদের সম্ভ্রম এবং ভূখণ্ডের উপর ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারা একের পর এক মুসলিম ভূখণ্ডে দখলদারীত্ব ও মানব রচিত কুফরী বিধান প্রতিষ্ঠিত করেছে। এক পর্যায়ে তাদের কুফরী শাসন ব্যবস্থা পাকা-পোক্ত করতে মুসলিম স্বজাতীয় কিছু গাদ্দার ও পথভ্রষ্ট আলেম উলামাকে পদ-পদবী ও স্বার্থের বিনিময়ে ক্রয় করে নিল।

এ ব্যাপারে তারা যথেষ্ট সচেতন যে, তাদের অবৈধ ভোগ বিলাস, জুলুম-অত্যাচার ও প্রভুত্বের রাজত্ব কায়েম রাখতে কি করতে হবে। তাই তারা মুসলমানদের গৌরবময় সোনালী ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়ার কর্মসূচি ও জিহাদের তামান্নাকে স্থিমিত করে দেওয়ার নানাবিধ কলাকৌশল এবং ধর্ম পালনকে ব্যক্তি জীবনের কিছু আচার অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া যাবতীয় পথ ও পদ্ধতি প্রয়োগ করল।

কারণ তারা ভাল করে জানে যে, মুসলমানরা যদি তাদের গৌরবময় শৌর্য-বীর্যের সোনালী ইতিহাস জানতে পারে এবং খেলাফতিভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে এবং এর জন্যে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে তাদের শাসন ব্যবস্থার মুলোৎপাটন হতে বাধ্য।

এজন্য তারা এবং তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গরা মিলে জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে নানা ধরণের অপকৌশল, মিথ্যা প্রচার, প্রচারণা, প্রপাগান্ডা চালিয়ে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করে জিহাদ হতে সরিয়ে রাখতে চায় উপরন্ত মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে দিতে চায়।

বক্ষমান ম্যাগাজিনটি তারা এবং তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গদের রোপিত মাগাজী বিষয়ক ভ্রান্তিগুলো চিহ্নিত করে কুরআন-সুন্নাহর, ফিকহ, ইতিহাস, বাস্তবতা ও যুক্তির আলোকে নিরসন করার চেষ্টা করেছি এবং যাদের শরীর থেকে দ্বীগ্বিজয়ী বীর মুজাহীদদের খুন এখনও শুকিয়ে যায়নি সেসব ঘুমন্ত সিংহ শাবকগুলোকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টাও করেছি।

এটি লিখতে যে সব ভাইদের সহযোগীতা পেয়েছি তাদের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে আল্লাহ (সুব:) এর নিকট আবেদন এই যে, তিনি যেন এই কিতাবটিকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করেন। উপরন্ত আমাকে ও আমার পরিবারদেরকে এবং সকল মুসলমানদের জন্য নাজাতের উসিলা করেন। আমীন।

JIHAD
[ji-hahd]
“to war against non-Muslims”

ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা পর্ব-২

আদনান মারুফ

অনেকেই প্রশ্ন করেন, ইসলাম প্রচারের জন্য জিহাদের কি প্রয়োজন? কাফেরদের দাওয়াত দিলে এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করলেই তো তারা মুসলমান হয়ে যাবে। শুধু শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মারামারি-কাটাকাটির কি প্রয়োজন? কিন্তু বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

কেননা মানুষ শুধু হককে না চেনা, সত্য ধর্মকে উপলব্ধি করতে না পারা এ কারণেই সত্যগ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় বিষয়টা মোটেও এমন নয়, বরং বেশিরভাগ লোকই সত্যকে বুঝার পরেও নানা প্রতিবন্ধকতা ও পারিপার্শ্বিক কারণে সত্যধর্ম গ্রহণ করে না। তাই কাফেরদের যতই দাওয়াত দেওয়া হোক, তাদের সাথে যতই উত্তম আচরণ করা হোক এবং ইসলামের সত্যতা তাদের সামনে যত উজ্জ্বল করেই তুলে ধরা হোক, এর দ্বারা খুব কম সংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করবে। কুরআন থেকে এ বিষয়টা সুস্পষ্টরূপে বুঝে আসে।

পুরো কুরআনে একবার সাধারণভাবে নজর বুলিয়ে যে কেউ বুঝতে পারবে, প্রধাণত তিন কারণে মানুষ সত্য ধর্মগ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়,

১. বাপদাদার অন্ধ অনুসরণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (سورة الزخرف : 23)۔

(হে রাসূল) আমি তোমার পূর্বে যখনই কোন জনপদে কোন সতর্ককারী (রাসূল) পাঠিয়েছি, তখন সেখানকার বিত্তবানেরা একথাই বলেছে যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে একটা মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। আমরা তাদেরই পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলছি। -সূরা যুখরুফ, ২৩

২. সত্যধর্ম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অহংকার ও জাত্যভিমান। প্রত্যেক জাতি সাধারণত নিজেদেরকে অন্য জাতির চেয়ে উত্তম মনে করে, এমনকি যদি তাদের শ্রেষ্ঠত্বের তেমন কোন কারণ না থাকে তথাপিও। (যেমন বর্তমান কাঙ্গাল বাঙ্গালীরা দূর্নীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হওয়ার পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এতটাই অনুন্নত যে, কোন ধরণের মেশিনারি উৎপাদনের সক্ষমতা তাদের নেই। এমনকি সামান্য কেঁচিটাও চীন-পাকিস্তান থেকে আমদানি করতে হয়। তা সত্ত্বেও তারা দিনরাত বাঙ্গালী হওয়ার কারণে নিজেদের বন্দনা গাইতে থাকে।) আর যদি এর সাথে তাদের কিছুটা শক্তি-সামর্থ্যও থাকে তবে তো তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। অন্য কোন জাতির ধর্ম, বিশেষত যদি সেই ধর্মের অনুসারীরা দুর্বল হয় তবে তা গ্রহণ করা দূরে থাক- তাদের পাত্তাই দিতে চায় না। তাই তাদের নিকট সত্যধর্ম গ্রহণের প্রস্তাব

দেওয়া হলে এবং তারা তা সত্য বলে উপলব্ধি করতে পারলেও মেনে নিতে অস্বীকার করে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো ইহুদীরা, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ (146)۔

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) এতটা ভালোভাবে চেনে _যেমন চেনে নিজেদের সন্তানদেরকে।” -সুরা বাকারা, ১৪৬

ফেরআউন ও তার জাতি মূসা আলাইহিস সালামকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করতো। কিন্তু অহংকারের কারণে তারা মুসার আনিত ধর্ম গ্রহণ করেনি। কুরআন তাদের ব্যাপারে বলেছে,

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا (سورة النمل : 14)۔

“তারা সীমালঙ্ঘন ও অহমিকা বশত তা সব অস্বীকার করলো, যদিও তাদের অন্তর সেগুলো (সত্য বলে) বিশ্বাস করে নিয়েছিলো।” -সূরা নামল, ১৪

মক্কার কাফেররা ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও কেবলমাত্র অহংকার ও হঠকারিতা বশতই নবীজির দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন,

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ

“যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা কেবল এ কারণেই তা অবলম্বন করেছে যে, তারা আত্মম্ভরিতা ও হঠকারিতায় লিপ্ত রয়েছে।” (সূরা সোয়াদ, ২ আয়াতের তরজমার জন্য দেখুন, তাওযীহুল কুরআন, ৩/১৮৬)

আয়াতের তাফসীরে ইমাম আলূসী রহ. বলেন,

وجعلها –يعني كلمة (بل) - بعضُهم للإضراب عما يُفهم مما ذُكر ونحوِه، مِن أن مَن كفر لم يكفر لخلل فيه، فكأنه قيل: من كفر لم يكفر لخلل فيه، بل كفر تكبرا عن اتباع الحق وعنادا، وهو أظهر من جعل ذلك إضرابا عن صريحه .... ويمكن أن يكون الجواب الذي عنه الإضراب: ما أنت بمقصر في تذكير الذين كفروا وإظهار الحق لهم، ويشعر به الآيات بعد وسبب النزول الآتي ذكره إن شاء الله تعالى، فكأنه قيل: "ص والقرآن ذي الذكر، ما أنت بمقصر في تذكير الذين كفروا وإظهار الحق لهم، بل الذين كفروا مقصرون في اتباعك والاعتراف بالحق" .... والمراد بالعزة ما يظهرونه من الاستكبار عن الحق.(روح المعاني 12/156)۔

সংক্ষেপে এর সারমর্ম হলো, “কাফেররা ইসলামগ্রহণ না করার কারণ এটা নয় যে, কুরআনের মাঝে কোন ত্রুটি রয়েছে, কিংবা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া এবং তাদের নিকট সত্যকে স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে কোন কমতি করেছেন, বরং তারা অহংকারের কারণে সত্যকে বুঝেও গ্রহণ করছে না।” -রুহুল মাআনী, ১২/১৫৭

তেমনিভাবে কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি, প্রত্যেক নবীর দাওয়াতের বিরোধীতা নেতৃস্থানীয় অহংকারী লোকেরাই করেছে, তারা নবীদের দাওয়াতকে নিচুশ্রেণীর লোকদের দাওয়াত বলে প্রত্যাখ্যান করেছে, নিচের আয়াতগুলো লক্ষ্য করুন।

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31سورة الزخرف)۔

“তারা বললো, এ কুরআন দুই জনপদের কোন বড় ব্যক্তির উপর নাযিল করা হল না কেন? (‘দুই জনপদ’ দ্বারা ‘মক্কা মুকাররামা’ ও ‘তায়েফ’ বোঝানো হয়েছে। এতদঞ্চলে এ দু’টিই ছিল বড় শহর। তাই মুশরিকরা বললো, এ দুই শহরের কোন বিত্তবান সর্দারের উপরই কুরআন নাযিল হওয়া উচিত ছিল। (দেখুন, সূরা যুখরুফ, ৩১ তাওযীহুল কুরআন, ৩/২৯৬ আরো দেখুন, সূরা সদ, ৮)

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (سورة الأعراف : 76)۔

“তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক নেতৃবর্গ, যে সকল দুর্বল লোক ইমান এনেছিল, তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি এটা বিশ্বাস করো যে, সালিহ নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল? তারা বললো, নিশ্চয়ই আমরা তো তাঁর মাধ্যমে প্রেরিত বাণীতে ইমান রাখি। সেই দাম্ভিক লোকেরা বললো, তোমরা যে বাণীতে ইমান এনেছো আমরা তো তা প্রত্যাখ্যান করি।” -সূরা আ’রাফ, ৭৬

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ (سورة الأعراف : 88)۔

“তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দারগণ বললো, হে শুয়াইব! আমরা পাকাপাকিভাবে ইচ্ছা করেছি, তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ইমান এনেছে তাদের সকলকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব, অন্যথায় তোমাদের সকলকে আমাদের দ্বীনে ফিরে আসতে হবে। শুয়াইব বললো, আমরা যদি (তোমাদের দ্বীনকে) ঘৃণা করি তবুও কি?”-সূরা আরাফ, ৮৮

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (سورة هود 27)۔

“তার সম্প্রদায়ের যারা কুফর অবলম্বন করেছিলো, তারা বলতে লাগলো, আমরা তো তোমাকে আমাদের মতই মানুষ দেখছি, এর বেশি কিছু নয়। আমরা আরও দেখছি তোমার অনুসরণ করছে কেবল সেই সব লোক, যারা আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বহীন, এবং তাও ভাসা-ভাসা চিন্তার ভিত্তিতে এবং আমরা তোমার মাঝে এমন কিছু দেখতেছি না, যার কারণে আমাদের উপর তোমার কিছু শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে। বরং আমাদের ধারণা তোমরা সকলে মিথ্যাবাদী।” -সূরা হুদ, ২৭

অহংকার সত্যধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় হওয়ার ব্যাপারে কুরআনে শত শত আয়াত রয়েছে। যারা কিছুটা হলেও কুরআন অধ্যয়ন করেন তাদের নিকট বিষয়টা অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। তাই এ বিষয়ে আর উদ্ধৃতি বাড়িয়ে প্রবন্ধ দীর্ঘ করতে চাচ্ছি না।

৩. রাজা-বাদশাহ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অনুসরণ। মানুষ সাধারণভাবেই রাজা-বাদশাহদের অনুসরণ করে, বিজয়ী জাতি ও প্রভাবশালী লোকদের কথা অনুযায়ী চলে। তেমনিভাবে রাজা-বাদশাহ ও শক্তিশালী জাতিবর্গও অধীনস্ত ও দুর্বলদের কৌশলে ও চাপপ্রয়োগ করে তাদের ধর্মের অনুসারী বানিয়ে রাখে, এ ব্যাপারে অনেক আয়াত ও হাদিস রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ দুয়েকটি উল্লেখ করছি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. (سورة إبراهيم : 21)۔

“সমস্ত মানুষ আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। যারা (দুনিয়ায়) দুর্বল ছিল, তারা বড়ত্ব প্রদর্শনকারীদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদেরই অনুগামী ছিলাম। এখন কি তোমরা আমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে একটু বাঁচাবে?” -সূরা ইবরাহীম, ২১

কিয়ামতের দিন কাফেররা বলবে,

رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (سورة الأحزاب : 67)۔

‘হে আমাদের প্রতিপালক! প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও আমাদের গুরুজনদের আনুগত্য করেছিলাম, তারাই আমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। ফলে তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে। -সূরা আহযাব, আয়াত: ৬৭ (আরো দেখুন, সূরা গাফির, ৪৭)

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন-

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (سورة الصافات : 27 - 28)۔

তারা একে অন্যের অভিমুখী হয়ে পরস্পরে সওয়াল-জওয়াব করবে। (অধিনস্তরা তাদের নেতৃবর্গকে) বলবে, তোমরাই তো অত্যন্ত শক্তিমানরূপে আমাদের কাছে আসতে। (অর্থাৎ আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে যেন আমরা কিছুতেই ইমান না আনি। (সুরা সাফফাত, ২৭-২৮ তাওযীহুল কুরআন, আল্লামা তাকী উসমানী ৩/১৬১-১৬২)

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন,

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (سورة سبأ 31)۔

“তুমি যদি সেই সময়ের দৃশ্য দেখতে যখন যালেমদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে আর তারা একে অন্যের কথা রদ করবে। (দুনিয়ায়) যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়েছিল তারা ক্ষমতা-দর্পীদেরকে বলবে, তোমরা না হলে আমরা অবশ্যই মুমিন হয়ে যেতাম।” –সূরা সাবা, ৩১

এ মর্মে কয়েকটি হাদীস রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কায়সারের নিকট প্রেরিত দাওয়াতি পত্রে লিখেন,

أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين

‘ইসলাম গ্রহণ করো, শান্তি পাবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে বহুগুণ সওয়াব দান করবেন। আর যদি তুমি (ইসলাম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জনসাধারণের (ইসলাম গ্রহণ না করার) গুনাহও তোমার উপর বর্তাবে। -সহিহ বুখারী: ৭ সহিহ মুসলিম: ১৭৭৩

এ হাদিসের ব্যাখায় হাফেয ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারীতে বলেন,

قال الخطابي: أراد أن عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليدا له لأن الأصاغر أتباع الأكابر. (فتح الباري: 39\1 ط. دار المعرفة)۔

“খত্তাবী রহ. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য হলো, যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ না করো তাহলে তোমার অনুসারী ও দুর্বল প্রজাদের ইসলাম গ্রহণ না করার গুনাহের ভারও তোমার উপর বর্তাবে। কেননা তারা তোমার অনুসরণ করেই ইসলাম গ্রহণ করবে না। কারণ দুর্বলরা প্রভাবশালীদের অনুসরণই করে থাকে।” -ফাতহুল বারী: ১/৩৯

ইমাম বুখারী কায়েস বিন আবী হাযেম থেকে বর্ণণা করেন,

دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب، ... قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: «بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم»، قالت: وما الأئمة؟ قال: «أما كان لقومك رءوس وأشراف، يأمرونهم فيطيعونهم؟» قالت: بلى، قال: «فهم أولئك على الناس». صحيح البخاري: (3834)۔

আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু একদিন আহমাস গোত্রের যয়নাব নামী এক মহিলার সাথে সাক্ষাৎ হয়। .... মহিলা তাকে প্রশ্ন করে, জাহেলী যমানার পর যে উত্তম দ্বীন ও কল্যাণময় জীবন বিধান আল্লাহ তায়ালা আমাদের দান করেছেন, সে দীনের উপর আমরা কতদিন সঠিকভাবে টিকে থাকতে পারবো? আবু বকর রাযি. বললেন, যতদিন তোমাদের নেতৃবর্গ তোমাদের নিয়ে দীনের উপর অবিচল থাকবেন। মহিলা জিজ্ঞাসা করলো, নেতৃবর্গ কারা? আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু বললেন, তোমার গোত্রে কি এমন সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোক নেই, যাদের আদেশ-নিষেধ মানুষ

মেনে চলে? মহিলা উত্তর দিল, হাঁ, আছে। আবু বকর বললেন, তারাই নেতৃবর্গ। -সহিহ বুখারী, ৭/৩৭৩ ইসলামী ফাউন্ডেশন হাদিসের ব্যাখায় হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন,

قوله: «ما استقامت بكم ...أئمتكم» أي لأن الناس على دين ملوكهم، فمن حاد من الأئمة عن الحال مال وأمال. (فتح الباري 7 : 151ط: دار الفكر، مصور عن الطبعة السلفية).

“(তোমরা ইসলামের উপর থাকবে) যতদিন তোমাদের নেতৃবর্গ তোমাদের নিয়ে দীনের উপর অবিচল থাকবেন”, কেননা মানুষ তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনুসরণ করে, সুতরাং নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি সঠিক পথ থেকে সরে গেলে সে নিজেও পথভ্রষ্ট হয়, মানুষকেও পথভ্রষ্ট করে।” ফাতহুল বারী, ৭/১৫১

উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা গেল, হক বুঝার পরও গোঁড়ামি-অহংকার, বাপ-দাদা ও নেতাদের অনুসরণ বা কুফরী ধর্ম বিজয়ী হওয়ার কারণে বেশীরভাগ লোক ইসলাম গ্রহণ করে চিরস্থায়ী শান্তির পথে আসে না। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করার নিমিত্তে ইসলাম ইকদামী তথা আক্রমণাত্মক জিহাদের নির্দেশ দিয়েছে এবং কাফেরদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হত্যা করার পাশাপাশি যুদ্ধে সক্ষম সাধারণ কাফেরদেরও ব্যাপকভাবে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছে, যেন ওদের শক্তি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। এরপর ওদেরকে লাঞ্চিত-অপদস্থ করে জিযয়া গ্রহণের কিংবা বন্দী করে দাস-দাসী বানানোর আদেশ দিয়েছে। তখন অন্যদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধাপ্রদান করার মতো কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও থাকবে না এবং নিজেদের গর্ব ও জাত্যভিমানও ওদের ইসলাম গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। বরং তখন তারা লাঞ্চনা হতে মুক্তির জন্য বাপদাদার অন্ধ অনুসরণ ছেড়ে ইসলাম গ্রহণে সম্মত হয়ে যাবে।

উপরোক্ত বিধানগুলোর বাস্তব ফলাফল আমরা ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, যখনই মুসলমানরা যুদ্ধ করে কাফেরদের দেশ দখল করে নেয়, তাদের প্রভাবশালী লোকদের হত্যা করে এবং ইসলাম বিজয়ী ধর্ম হিসেবে আভির্ভূত হয় তখন খুব সহজেই মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে *সুরা নাসরের আয়াতগুলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2)
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ

‘যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং তুমি মানুষকে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে দেখবে, তখন তুমি আল্লাহর প্রশংসা সহ তাসবীহ পাঠ করবে। -সুরা নাসর, আয়াত : ১-৩

আয়াতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, বিজয়ের দ্বারা দ্রুততম সময়ে বিপুল পরিমান মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে।

সামনে কয়েকটি আয়াতের তাফসীরসহ উলামায়ে কেরামের আরো কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি যেগুলোতে ইকদামী জিহাদ, নেতৃস্থানীয় কাফেরদেরকে হত্যা করার উপকারিতা ও পরোক্ষ চাপপ্রয়োগের ব্যাপারটি খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সম্মানিত পাঠকদের মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করার সবিনয় অনুরোধ করছি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“তোমরা সর্বোত্তম উত্তম, তোমাদের বের করা হয়েছে মানুষের কল্যাণার্থে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে।” -সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১০

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

السؤال الأول: من أي وجه يقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله كون هذه الأمة خير الأمم مع أن هذه الصفات الثلاثة كانت حاصلة في سائر الأمم؟.
والجواب: قال القفال: تفضيلهم على الأمم الذين كانوا قبلهم إنما حصل لأجل أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بآكد الوجوه وهو القتال لأن الأمر بالمعروف قد يكون بالقلب وباللسان وباليد، وأقواها ما يكون بالقتال، لأنه إلقاء النفس في خطر القتل وأعرف المعروفات الدين الحق والإيمان بالتوحيد والنبوة، وأنكر المنكرات: الكفر بالله، فكان الجهاد في الدين محملا لأعظم المضار لغرض إيصال الغير إلى أعظم المنافع، وتخليصه من أعظم المضار، فوجب أن يكون الجهاد أعظم العبادات، ولما كان أمر الجهاد في شرعنا أقوى منه في سائر الشرائع، لا جرم صار ذلك موجبا لفضل هذه الأمة على سائر الأمم، وهذا معنى ما روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرونهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقروا بما أنزل الله، وتقاتلونهم عليه و «لا إله إلا الله» أعظم المعروف، والتكذيب هو أنكر المنكر.
ثم قال القفال: فائدة القتال على الدين لا ينكره منصف، وذلك لأن أكثر الناس يحبون أديانهم بسبب الألف والعادة، ولا يتأملون في الدلائل التي تورد عليهم فإذا أكره على الدخول في الدين بالتخويف بالقتل دخل فيه، ثم لا يزال يضعف ما في قلبه من حب الدين الباطل، ولا يزال يقوى في قلبه حب الدين الحق إلى أن ينتقل من الباطل إلى الحق، ومن استحقاق العذاب الدائم إلى استحقاق الثواب الدائم. (الفتسير الكبير : 324\8 دار إحياء التراث العربي) ـ

প্রশ্ন: সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজে বাধা দেওয়া এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনা কিভাবে সর্বোত্তম জাতি হওয়ার মাধ্যম হলো, অথচ এ গুণাবলী তো সব উম্মতের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল?

উত্তর: কাফফাল রহ. বলেন, অন্যান্য উম্মতের উপর এ উম্মতকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ হলো এ উম্মত সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা তথা যুদ্ধের মাধ্যমে করবে, কেননা সৎকাজের আদেশ অন্তর, মুখ, ও হাতের মাধ্যমেও হয়, কিন্তু তা সবচেয়ে কার্যকরীভাবে হয় যুদ্ধের মাধ্যমে, কেননা এতে নিহত হওয়ার আশংকা থাকে। আর সবচেয়ে বড় সৎকাজ হলো সত্য ধর্ম এবং তাওহিদ ও নবুওয়াতের প্রতি ইমান আনা। আর সবচেয়ে বড় অন্যায় হলো কুফর। সুতরাং ধর্মের জন্য জিহাদ হলো অন্যকে সবচেয়ে বড়

কল্যাণের পথে নিয়ে আসা এবং সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয় থেকে বাঁচানোর জন্য নিজেকে সবচেয়ে বড় ক্ষতির সম্মুখীন করা। এ কারণেই জিহাদ সবচেয়ে বড় ইবাদত। আর যেহেতু আমাদের ধর্মে পূর্ববর্তী ধর্মের তুলনায় জিহাদের গুরুত্ব বেশি তাই এই জিহাদই অন্যান্য উম্মতের উপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। এ বিষয়টিই ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখায় বলেন, ‘তোমরা সর্বোত্তম জাতি, যাদের উত্থান হয়েছে মানুষের কল্যাণার্থে। তোমরা মানুষকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দেওয়ার এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধিবিধান মেনে নেওয়ার আদেশ দিবে, এজন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহার সাক্ষ্যপ্রদান হলো সবচেয়ে বড় সৎকাজ আর কুফর হলো সবচেয়ে মন্দ কাজ।’

এরপর কফফাল বলেন, দীনের জন্য যুদ্ধ করার উপকারিতা কোন ন্যায়পরায়ণ মানুষ অস্বীকার করতে পারে না। কেননা অধিকাংশ মানুষই ঘনিষ্টতা ও অভ্যাসের কারণে নিজের ধর্মকে ভালোবাসে, এবং (ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে) তাদের সামনে যে দলিল পেশ করা হয় তা নিয়ে তারা চিন্তাভাবনা করে না। যখন তাদেরকে হত্যার ভয় দেখিয়ে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করানো হয় তখন সে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর তাদের অন্তরে বাতিল ধর্মের প্রতি লালিত ভালোবাসা ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে এবং সত্য ধর্মের ভালোবাসা দৃঢ় হতে থাকে। ফলে এক পর্যায়ে তারা বাতিল ধর্ম ছেড়ে সত্য ধর্মকে আপন করে নেয় এবং চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে চিরস্থায়ী পুরস্কার লাভের হকদার হয়। -তাফসীরে রাযী: ৮/৩২৪

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ. বলেন,

اعلم أن أتم الشرائع وأكمل النواميس هو الشرع الذي يؤمر فيه بالجهاد، وذلك لأن تكليف الله عباده بما أمر ونهى - مثله كمثل رجل مرض عبيده، فأمر رجلا من خاصته أن يسقيهم دواء، فلو أنه قهرهم على شرب الدواء، وأوجره في أفواههم لكان حقا، لكن الرحمة اقتضت أن يبين لهم فوائد الدواء؛ ليشربوه على رغبة فيه، وأن يخلط معه العسل؛ ليتعاضد فيه الرغبة الطبيعية والعقلية.

ثم إن كثيرا من الناس يغلب عليهم الشهوات الدنية والأخلاق السبعية ووساوس الشطان في حب الرياسات، ويلصق بقلوبهم رسوم آبائهم، فلا يسمعون تلك الفوائد، ولا يذعنون لما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتأملون في حسنة، فليست الرحمة في حق أولئك أن يقتصر على إثبات الحجة عليهم، بل الرحمة في حقهم أن يقهروا؛ ليدخل الإيمان عليهم على رغم أنفهم بمنزلة إيجاد الدواء المر، ولا قهر إلا بقتل من له منهم بكناية شديدة وتمنع قوى، أو تفريق منعتهم وسلب أموالهم حتى يصيروا لا يقدرون على شيء، فعند ذلك يدخل أتباعهم وذراريهم في الإيمان برغبة وطوع، ولذلك كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر كان عليك إثم الأريسيين.

وربما كان أسرهم وقهرهم يؤدي إلى إيمانهم، وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل.

وأيضا فالرحمة التامة الكاملة بالنسبة إلى البشر أن يهديهم الله إلى الاحسان، وأن يكبح ظالمهم عن الظلم، وأن يصلح ارتفاقاتهم وتدبير منزلهم وسياسة مدينتهم، فالمدن الفاسدة التي يغلب عليها نفوس السبعية، ويكون لهم تمنع شديد إنما هو بمنزلة الأكلة في بدن الإنسان لا يصح الإنسان إلا بقطعه، والذي يتوجه إلى إصلاح مزاجه وإقامة طبيعته لا بد له من القطع، والشر القليل إذا كان مفضيا إلى الخير الكثير واجب فعله،

ولك عبرة بقريش ومن حولهم من العرب كانوا أبعد خلق الله عن الاحسان وأظلمهم على الضعفاء، وكانت بينهم مقاتلات شديدة، وكان بعضهم يأسر بعضا، وما كان أكثرهم متأملين في الحجة ناظرين في الدليل فجاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أشدهم بطشا وأحدهم نفسا حتى ظهر أمر الله، وانقادوا له، فصاروا بعد ذلك من أهل الإحسان، واستقامت أمورهم، فلو لم يكن في الشريعة جهاد أولئك لم يحصل اللطف في حقهم.

(حجة الله البالغة: 2/264 ط. دار الجيل: 1426 هـ)

“সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত তাই যাতে জিহাদের বিধান রয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের যে আদেশ-নিষেধ দিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হলো ঐ ব্যক্তির মতো যার গোলামরা অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাই সে তার ঘনিষ্ঠ কাউকে গোলামদের ঔষধ খাওয়াতে বলে, এখন যদি সেই ব্যক্তি ওদেরকে ঔষধ খেতে বাধ্য করে এবং (জোরপূর্বক) তাদের মুখে ঔষধ ঢেলে দেয় তাহলে তা ভালো কাজই হবে। কিন্তু রহমতের তাকাযা হলো তাদেরকে ঔষধের উপকারিতা বুঝিয়ে দেওয়া, যেন তারা সাগ্রহে তা সেবন করে, এবং ঔষধের সাথে মধু মিশিয়ে দেওয়া যেন বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রহের পাশাপাশি স্বভাবগত আগ্রহও সৃষ্টি হয় এবং একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে।

কিন্তু অনেক মানুষের উপর নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, পশুত্ব ও শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রবল হয়ে যায়, এবং তাদের অন্তর বাপ-দাদার আচার-রীতির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। তাই তারা (ইসলামের ধর্মের) উপকারিতাগুলো শুনতে চায় না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আদেশ দেন তা মেনে নেয় না, কল্যাণকর বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে শুধু ইসলামের সত্যতার প্রমাণ পেশ করাই যথেষ্ট নয়। বরং রহমতের তাকাযা হলো তাদেরকে পর্যুদস্ত করা হবে যেন ইমান তাদের অন্তরে প্রবেশ করে, অনেকটা (জোরপূর্বক) তিক্ত ওষুধ পান করানোর মত। আর তাদেরকে পর্যুদস্ত করার পদ্ধতি হলো তাদের মধ্যে যারা শক্তিশালী ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী তাদের হত্যা করা হবে কিংবা তাদের দলকে বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া হবে এবং ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হবে, যেন (ইসলামের বিপক্ষে) তাদের কোমর সোজা করে দাঁড়ানোর মত কোন শক্তিই অবশিষ্ট না থাকে। তখন তাদের অনুসারী ও সন্তান-সন্ততিরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করবে। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কায়সারের নিকট প্রেরিত চিঠিতে লিখেন, (যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ না কর) তাহলে তোমাকে তোমার অনুসারীদের (ইসলাম গ্রহণ না করার) গুনাহের ভারও বহন করতে হবে। কখনো তাদেরকে বন্দী ও পর্যুদস্ত করা তাদের ইমানের কারণ হয়। এ দিকে ইঙ্গিত করেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل

‘আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিদের দেখে অবাক হন যাদেরকে শিকলেবন্দী করে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়’। [সহিহ বুখারী: ৩০১০]

তাছাড়া এটাও মানবজাতির প্রতি রহমতের দাবী যে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাদেরকে (একে অপরের প্রতি) অনুগ্রহ করার দিকে পথপ্রদর্শন করবেন, যালেমদের যুলুম হতে বিরত রাখবেন, এবং মানুষের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, ও শহর-নগর পরিচালনার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু যে শহরগুলোর ক্ষমতা মন্দ লোকেরা দখল করে নেয় এবং তাদের প্রতাপ ও শক্তি থাকে তারা মানব দেহের পচনশীল ক্ষতের ন্যায়, তা কেটে ফেলা ব্যতীত মানুষ সুস্থতা লাভ করতে পারে না। চিকিৎসক তা কেটে ফেলতে বাধ্য। কেননা সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে প্রভুত কল্যাণ অর্জন করা গেলে তো সেই ক্ষতিকে মেনে নিতেই হয়।

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً

“কাফেরদের সাথে তোমাদের মোকাবেলা হলে তাদের গর্দান উড়াতে থাকো। অবশেষে যখন তোমরা তাদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করবে তখন তাদেরকে (বন্দী করে) শক্তভাবে বাঁধবে। তারপর হয়তো (তাদেরকে) মুক্তি দিবে অনুকম্পা দেখিয়ে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে।” -সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ৪

ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

أي: إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف

অর্থাৎ তোমরা শত্রুদের মুখোমুখী হলে তাদের কচুকাটা করো। -তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৭/৩০৭

আয়াতটির তাফসীর করতে গিয়ে ইমাম জাসসাস রহিমাহুল্লাহু বলেন,

لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإثخان في القتل وحظر عليه الأسر - إلا بعد إذلال المشركين وقمعهم - وكان ذلك وقت قلة عدد المسلمين وكثرة عدد عدوهم من المشركين، فمتى أثخن المشركون وأذلوا بالقتل والتشريد جاز الاستبقاء. (أحكام القرآن: 269\5 ط. دار إحياء التراث العربي: 1405 هـ)۔

“আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত করতে বলেছেন এবং মুশরিকদের লাঞ্ছিত করা ও তাদের শক্তি খর্ব করার পূর্বে বন্দী করতে নিষেধ করেছেন, ... সুতরাং মুশরিকদের পাইকারীহারে হত্যা করা, ওদেরকে হত্যা ও নির্বাসনের মাধ্যমে অপদস্থ করার পরই ওদেরকে জানে বাঁচানো জায়েয হবে।” -আহকামুল কুরআন, ৫/২৬৯

গত শতাব্দীর বরেণ্য আলেম শায়েখ আব্দুর রহমান সা’দী বলেন,

يقول تعالى مرشدا عباده إلى ما فيه صلاحهم، ونصرهم على أعدائهم {فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} في الحرب والقتال، فاصدقوهم القتال، واضربوا منهم الأعناق، حَتَّى تثخنوهم وتكسروا شوكتهم وتبطلوا شرتهم، فإذا فعلتم ذلك، ورأيتم الأسر أولى وأصلح، {فَشُدُّوا الْوَثَاقَ} أي: الرباط، وهذا احتياط لأسرهم لئلا يهربوا، فإذا شد منهم الوثاق اطمأن المسلمون من هربهم ومن شرهم، فإذا كانوا تحت أسركم، فأنتم بالخيار بين المن عليهم، وإطلاقهم بلا مال ولا فداء، وإما أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم، أو يشتريهم أصحابهم بمال، أو بأسير مسلم عندهم. (تفسير السعدي ص 784 ط. مؤسسة الرسالة)۔

‘আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের কল্যাণ এবং শত্রুদের উপর বিজয়ী হওয়ার পদ্ধতি বাতলে দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, যখন যুদ্ধে তোমরা কাফেরদের মুখোমুখি হও তখন ওদের বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে যুদ্ধ কর, ওদের গর্দান উড়াতে থাকো, যতক্ষণ না তাদেরকে ব্যাপকহারে হত্যা করে তাদের শক্তি খর্ব করতে পার এবং তাদের অনিষ্ট হতে তোমরা নিরাপদ হয়ে যাও। এরপর তোমাদের নিকট বন্দী করা ভালো মনে হলে তাদের কষে বাধো। কষে বাধতে বলা হয়েছে যেন ওরা পলায়ন করতে না পারে এবং মুসলমানরা তাদের পলায়ন ও অনিষ্ট হতে নিরাপদ হয়ে যায়। বন্দী করার পর তোমাদের ইখতিয়ার থাকবে তোমরা চাইলে তাদের উপর অনুগ্রহ করে মুক্তিপণ ব্যতিতই তাদের ছেড়ে দিতে পারো আর চাইলে তাদের থেকে মুক্তিপণ নিতে কিংবা তাদের মাধ্যমে বন্দী বিনিময় করতে পারো।” -তাফসীরে সা’দী, পৃ: ৭৮৪

হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. ও একই তাফসীর করেছেন, তিনি বলেন,

تمهارا جب كفار سے مقابله هو جائے تو ان كي گردنيں مارو (يعني قتل كرو) يها ں تك كے جب تم ان كي خوب خون ريزي كر چكو (جس كي حد يه هے كے اب اگر قتل موقوف كر كے بجائے اس كے قيد پر اكتفاء كيا جائے تو محتمل مضرتِ مسلمين وغلبہ كفار نه هو) تو (اس وقت كفار كو قيد كر كے) خوب مضبوط باندھ لو پهراس كے بعد (على سبيل منع الجمع تم كو دو باتو كا اختيار هے) يا تو بلا معاوضه چھوڑ دينا اور يا معاوضه لے كر چھو ڑدينا (بيان القرآن : 3 / 409)۔

“কাফেরদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ হলে তোমরা তাদের হত্যা করো, যখন তোমরা তাদের প্রচুর পরিমানে হত্যা করবে (যার সীমা হলো এখন তাদের হত্যা করার পরিবর্তে বন্দী করা হলেও কাফেরদের বিজয় কিংবা তাদের দ্বারা মুসলমানদের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না) তখন তাদের বন্দী করে মযবুত ভাবে বাধো। এরপর হয়তো বিনামূল্যে ছেড়ে দিবে কিংবা মুক্তিপণ নিয়ে ছাড়বে।” -বয়ানুল কুরআন ৩/৪০৯

শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. বলেন,

يعنی حق اورباطل کا مقابلہ تو رہتا ہی ہے۔ جس وقت مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہو جائے تو مسلمانوں کو پوری مضبوط ی اور بہادری سے کام لینا چاہئے۔ باطل کا زور جب ہی ٹوٹے گا کہ بڑے بڑے شریر مارے جائیں اور انکے جتھے توڑ دیے جائیں۔ اس لئے ہنگامہ کارزار میں کسل، سستی، بزدلی اور توقف و تردد کو راہ نہ دو۔ اور دشمنان خدا کی گردنیں مارنے میں کچھ باک نہ کرو۔ کافی خونریزی کے بعد جب تمہاری دھاک بیٹھ جائے اور ان کا زور ٹوٹ جائے اس وقت قید کرنا بھی کفایت کرتا ہے۔ قال تعالی: [مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ] یہ قید وبند ممکن ہے ان کے لئے

تازیانہ عبرت کا کام دے اور مسلمانوں کے پاس رہ کر انکو اپنی اور تمہاری حالت کے جانچنے اور اسلامی تعلیمات میں غور کرنے کا موقع بہم پہنچائے شدہ شدہ وہ لوگ حق و صداقت کا راستہ اختیار کر لیں۔ یا مصلحت سمجھو تو بدون کسی معاوضہ کے ان پر احسان کر کے قید سے رہا کرو۔ اس صورت میں بہت سے افراد ممکن ہے تمہارے احسان اور خوبی اخلاق سے متاثر ہو کر تمہاری طرف راغب ہوں اور تمہارے دین سے محبت کرنے لگیں۔ اور یہ بھی کر سکتے ہو کہ زر فدیہ لے کر یا مسلمان قیدیوں کے مبادلہ میں ان قیدیوں کو چھوڑ دو اس میں کئ طرح کے فائدے ہیں۔ بہرحال اگر ان اسیران جنگ کو انکے وطن کی طرف واپس کر و تو دو ہی صورتیں ہیں۔ معاوضہ میں چھوڑنا یا بلامعاوضہ رہا کرنا۔ ان میں جو صورت امام کے نزدیک اصلح ہو اختیار کر سکتا ہے۔ حنفیہ کے ہاں بھی فتح القدیر اور شامی وغیرہ میں اس طرح کی روایات موجود ہیں ہاں اگر قیدیوں کو ان کے وطن کی طرف واپس کرنا مصلحت نہ ہو تو پھر تین صورتیں ہیں۔ ذِمّی بنا کر بطور رعیت کے رکھنا یا غلام بنا لینا، یا قتل کر دینا۔ (فوائد عثماني ص 216-217 ط . فريد بك ڈپو) ۔

“অর্থাৎ হক ও বাতিলের লড়াই তো চিরন্তন। সুতরাং মুসলামনদের কাফেরদের সাথে যুদ্ধের সময় বীরত্বের সাথে অটল থেকে যুদ্ধ করতে হবে। বাতিলের শক্তি তখনই খর্ব হবে যখন ধাড়ি শয়তানগুলোকে হত্যা করা হবে এবং তাদের বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হবে।

তাই কাফেরদের সাথে যুদ্ধে ভীরুতা বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব করো না এবং তাদের গর্দান উড়াতে ভয় করো না। যথেষ্ট পরিমান রক্তপাত করার পর যখন কাফেরদের অন্তরে তোমাদের ভয় জমে যায় এবং কাফেরদের শক্তি খর্ব হয়ে যায় তখন বন্দী করাও যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “কোন নবীর পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, যমিনে (শত্রুদের) রক্ত ব্যাপকভাবে প্রবাহিত করার পূর্বে তার কাছে কয়েদী থাকবে।”

এই বন্দীত্ব তাদের জন্য উপদেশ ও দৃষ্টান্ত হতে পারে। পাশাপাশি মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনাচার প্রত্যক্ষ করা এবং ইসলামের শিক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সুযোগ হবে, ধীরে ধীরে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। আর যদি ভালো মনে করো তাহলে মুক্তিপণ ব্যতীত বা মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দিতে পারো। এতে অনেকেই তোমাদের অনুগ্রহ ও উত্তম চরিত্র দেখে তোমাদের ধর্মের প্রতি আগ্রহী হবে এবং তোমাদের মহব্বত করবে।” -তাফসীরে উসমানী: পৃ: ২১৬-২১৭

দেখুন, কাফেরদের সাথে শুধু দাওয়াত ও উত্তম আচরণই যদি তাদের ইসলাম গ্রহণের জন্য যথেষ্ট হতো তাহলে নবীজির দশ বছরের দাওয়াতে মক্কাবাসীরা মুসলিম হলো না কেন? রাসূল কি -নাউযুবিল্লাহ- তাদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি করেছেন, না তাদের সাথে উত্তম আচরণ করেননি? আসলে দয়া-উত্তম আচরণের দ্বারা কাজ হয় বিজয়ী হওয়া, বন্দী করা ও দাসদাসী বানানোর পরে। কেননা বিজয়ী জাতি ও মনিবরা যখন বিজিত জাতি, তাদের যুদ্ধ বন্দী ও দাসদাসীদের প্রতি দয়া করে তখন তা তাদের উত্তম আখলাক ও নৈতিকতার পরিচয় হয়। এজন্যই যখন মক্কা বিজয়ের পরে রাসূল কাফেরদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন তখন তারা খুব দ্রুত মুসলমান হয়ে যায়। পক্ষান্তরে পরাজিত জাতি বিজয়ী জাতির সাথে উত্তম আচরণ করলে সেটা তাদের উত্তম আখলাকের দলিল হওয়া তো দূরে থাক, বরং অনেক সময়ই বিজয়ীরা মনে করে তারা আমাদের শক্তির ভয়ে ভীত হয়ে তোষামোদ স্বরুপ উত্তম আচরণ করছে। তাই বিজয়ের পূর্বে উত্তম আচরণ তেমন ফলদায়ক হয় না।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে পাঠক আপনি নিজেই বিবেচনা করুন ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা আছে কি না এবং থাকলে তার মাত্রা কতখানি। আরো দেখুন কৌশলে তাদের উপর ইসলাম গ্রহণের চাপপ্রয়োগ করা হচ্ছে কি না।

চলবে ইনশাআল্লাহ ......

الجهاد محك الإيمان
জিহাদ ইমানের কষ্টিপাথর

নেক কাজের তাউফিক একটি অমুল্য নিয়ামত!

s-forayeji

বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ।

বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ সমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে নেক কাজের তাওফিক। নেক কাজের তাওফিক অনেক বড় একটি নিয়ামত। আমরা মনে করি, চাইলেই আমরা হয়ত কোন নেক কাজ করতে পারি। কিন্তু বাস্তবতা তা নয়, আর এ বিষয়টি বুঝতে না পারার কারণে আমরা তাউফিকের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারিনা, নিয়ামত হিসেবে তাউফিক চিহ্নিত করতে পারিনা। আর যখন তা পারিনা তখন স্বাভাবিক নিয়মে আমি, আমরা নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় থেকেও গাফেল থেকে যাই। কারণ নিয়ামত যদি না চিনতে পারি তাহলে শুকরিয়া আদায়ের প্রসঙ্গ কিভাবে আসবে! এর ফলে দেখা যায় আমাদের জীবনে নিয়ামতের পরিমাণ কমতে থাকে, কারণ রাসুল (সা:) বলেছেন, (ভাবার্থে) আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করার কারণে আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নেন এবং অন্য কাউকে দান করেন।

এক ভাইয়ের ঘটনা জানি - উনি একবার নিয়্যাত করলেন আল্লাহ্ চান তো আজ আমি কোন একটা ভালো কাজ করব। কি করা যায় এমন চিন্তা করতে থাকলেন। উনি এক আনসার ভাইয়ের বাসায় ছিলেন। তখন মাসের প্রায় শেষ এবং যে কোন কারণে উনার আনসার ভাইয়ের হাতের টাকাও প্রায় শেষ। তখন তিনি ভাবলেন আচ্ছা, আমি আমার আনসার ভাইয়ের মানিব্যাগে ৫০০০ টাকা রেখে দেই। আনসার ভাই জানবেন না টাকা কিভাবে আসলো বা হয়ত উনি বুঝতেই পারবেন না। আর কাজটি গোপন আমল হিসেবে কবুল হলে আল্লাহ ও খুশি হবেন! কিন্তু দুর্বলতার কারণে শেষ পর্যন্ত উনি তা করতে পারলেন না। ৫০০০ টাকা উনার কাছে বেশ ভারী মনে হচ্ছিলো।

এরপরে তিনি মসজিদে গেলেন যোহরের নামাজ পড়তে। নামাজ শেষে দেখলেন আল্লাহর এক বান্দা সাহায্যের জন্য দাঁড়িয়েছেন। সেই ভাই ভাবলেন, আমি তো আমার আনসার ভাইকে ৫০০০ টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারিনি সত্য, কিন্তু আল্লাহ্ চাইলে আমি এই ভাইকে তো কিছু সাহায্য করতেই পারি। এরপরে তিনি সেই ভাইকে ১০০০ টাকা সাদাকাহ করলেন।

ভাইয়ের ভাষ্যমতে, - প্রথমে যখন আমি ৫০০০ টাকার নিয়াত করেছিলাম তখন আমার দুর্বলতার জন্য আমি তা করতে পারিনি। কিন্তু আল্লাহ্ আমার দুর্বলতার কথা আমার চেয়েও সবচেয়ে উত্তম ভাবে জানতেন। তাই তিনি ঐ একই দিনে যোহরের সময়ে আমার সামনে আরেকটি সুযোগ দিলেন - যা আমার জন্য সহজ হয়। আমার তো মনে হয়েছিলো, যদি আমি ঐ ১০০০ টাকার ব্যাপারেও পাশ না করতে পারতাম তাহলে আল্লাহ্ হয়ত আমাকে ৫০০ টাকার কোন সুযোগ দান করতেন, আল্লাহ্ না করুন যদি আমি তাও পাশ না করতাম হয়ত তিনি আমাকে ৫০ টাকা সাদাকার কোন সুযোগ দিতেন। আসলে আল্লাহ্ এভাবে তাঁর বান্দাদের সামনে সুযোগ দান করতেই থাকেন যেন বান্দা তা গ্রহন করে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকেতাউফিক প্রাপ্ত হয় আল্লাহর আরো নিকটবর্তী হবার ব্যাপারে।

তবে হ্যা, আল্লাহ্ না করুন এমনও কখনো হয় - আমরা এমন উদাসীন থাকি যে, আমাদের সামনে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন নেক কাজের সুযোগ আসতেই থাকে একের পর এক কিন্তু আমরা সে ব্যাপারে কোন খেয়ালই রাখিনা। আর এমন ভাবে আমাদের অনবরত উদাসীনতার কারণে কোন একদিন আমরা হয়ত এসব নিয়ামত থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে যাই যা আমাদের চেতনাতেও থাকেনা! অর্থাৎ আমরা নেক কাজের কোন তাউফিক পাইনা, নেক কাজের কোন আকাঙ্খা আমাদের অন্তরে আসেনা! যদি চিন্তা করে দেখতাম তাহলে হয়ত আমরা খুঁজে পেতাম এর জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী আর তা এভাবে যে, আমরা প্রতিনিয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের সামনে নিয়ামত হিসেবে হাজির হওয়া অনেক (আমদের দৃষ্টিতে মনে হওয়া ছোট) নেক কাজের তাউফিক কে আমরা পরিত্যাগ করেছি, পাশ কাটিয়ে গেছি অথবা আরো খারাপ যে, কখনো বুঝতেই পারিনি সেগুলো ছিলো নিজেদের গুনাহ সমূহ ঝরিয়ে নেয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবর্ন সুযোগ!

প্রতিটি নেক কাজের সুযোগ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। কখনো এমন চিন্তা করা উচিৎ নয় যে, কাজ টি "কত বড়" বা "কত ছোট"। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক কিছু সরিয়ে দেয়ার কাজকেও ঈমানের শাখা হিসেবে বলা হয়েছে। আমাদের জানা আছে, সাদ ইবনে মুয়াজ (রা:) এর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিলো! সেই মহান সাহাবীর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি কেমন ছিল? সাদ (রা:) যখন মুসয়াব ইবনে উমায়ের (রা:) কে দেখলেন ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন তখন তিনি বর্শা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসলেন মুসয়াব (রা:) কে দেখে নিতে! মুসয়াব (রা:) বললেন, আপনি বরং আমার কিছু কথা শুনুন, যদি ভালো লাগে শুনবেন আর যদি ভালো না লাগে তবে আপনার যা ভালো লাগবেনা তা আমি আপনাকে বলবোনা। সাদ (রা:) ভাবলেন বেশ, উত্তম প্রস্তাব। তিনি বর্শা মাটিতে গেঁড়ে বসে গেলেন মুসয়াব (রা:) এর কথা শুনতে। লক্ষ্য করেন, সাদ (রা:) এর জন্য এটি ছিলো একটি ভালো কাজের জন্য প্রথম এবং ছোট পদক্ষেপ। কাজটি ছিলো কিছু ভালো কথা শোনার দাওয়াত কবুল করা। আর এই কাজের মধ্য দিয়েই আল্লাহ্ উনাকে ইসলামের নূর দান করলেন! সাদ (রা:) মৃত্যুতে জিবরীল (আ:) উত্তম পোশাক এবং পাগড়ী পরিধান করে আসমান থেকে নেমে এসেছিলেন, আর রাসুল (সা:) কে সংবাদ দিয়েছেন আজ আপনার এক সাহাবী মারা গেছেন! আর এই সমস্ত নেয়ামতের প্রথম কদমটি ছিলো খুব ছোট, সাধারণ একটি কাজ, - কিছু ভালো কথা শোনার দাওয়াত কবুল করা।

এমন অনেক ছোট ছোট নেক আমল থাকে যা অহরহই আমাদের চোখের আড়ালে থেকে যায় কারণ সেগুলো হয়ত "ছোট নেক আমল" তাই। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা দরকার হয়ত আমরা এমনই যে, আমাদের জন্য "বড় আমল" গুলো ভারী হয়ে যেত তাই আল্লাহ্ আমার জন্য ছোট এবং সহজ করে দিয়েছেন। যেন আমি অন্তত বঞ্চিত না থেকে যাই। একই সাথে এও মনে রাখা দরকার ছোট নেক কাজ গুলো সাধারনত মারাত্মক এক কবিরা গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকে তা হচ্ছে "রিয়া"। কারণ আমল হিসেবে সেগুলো এমন ছোট যে, সেগুলোর মধ্যে দেখানোর তেমন কিছু নাই। তাই আমল হিসেবে ছোট হলেও পরিপুর্ন ইখলাস এবং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুস্টির জন্য এসব আমল সহজ হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ। একই সাথে এই ছোট নেক আমল গুলো হচ্ছে রিয়া মুক্ত হয়ে ইখলাসের সাথে বড় আমল করার জন্য প্র্যাকটিস ও বটে!

ছোট বাচ্চা যখন রঙ পেন্সিল নিয়ে খুব মনোযোগের সাথে ছবি আঁকে এবং তার বাবাকে খুব আগ্রহ নিয়ে দেখায় আর বলে, বাবা বলো তো এই ছবি টা কেমন হয়েছে? বাবা তাকিয়ে দেখে মেয়ে আসলে রঙ বেরঙের কিছু এলোমেলো লাইন এঁকেছে! বাবা কি বলবে আরে এটা তো কিচ্ছু হয়নি! বরং বাবা বলবে - কি এঁকেছ বাবা, বেশ চমৎকার হয়েছে! বাবা কেন এ কথা বলবে?

প্রথম কারণ - তিনি বাবা আর ছবি একেছে তার অবুঝ সন্তান তাই। দ্বিতীয় কারন - এই অবুঝ সন্তানের একান্ত আগ্রহ নিয়ে আকা ঐ হাবি জাবিই বাবার কাছে অনেক প্রিয়। তাহলে এবার ভেবে দেখেন আমাদের এমন খুব ছোট ছোট কাজ গুলো যদি আন্তরিকতার সাথে শুধু আল্লাহর জন্য হয়ে যায় তবে আল্লাহ তা কত পছন্দ করবেন! কারণ নিশ্চিত ভাবেই আল্লাহ আমাদের নিজেদের বাবা মা অপেক্ষা অধিক ভালোবাসেন!

কোন নেক কাজের সুযোগকেই এই বলে পাশ কাটানো উচিৎ নয় যে, "এ আর এমন কি!" কারণ আপনি নিশ্চিতই জানেন না যে, এই কাজের মধ্যে আল্লাহ্ কি পরিমাণ বারাকাহ লুকিয়ে রেখেছেন। কারণ আল্লাহ্ বৃদ্ধির ওয়াদা করেছেন। প্রত্যেকটি নেক কাজের তাউফিক আমার এবং আপনার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর দিকে আরো একটু এগিয়ে যাবার দাওয়াত,

খুব ক্ষতি হয়ে যাবে যদি আমরা আল্লাহর অনুগ্রহকে "ছোট" বলে প্রত্যাখান করি!

আর হ্যা, নিশ্চয়ই সকল তাউফিক শুধু মাত্র মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই।

সহিহ হাদিসের আলোকে

ইমাম মাহদীর

আমলে মুসলমানদের বিজয়, প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি

আদনান মারুফ

ইমাম মাহদীর রাজত্বকাল

سليمان بن عبيد، ثنا أبو الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا». رواه الحاكم (8673) وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد (17/255 ط. الرسالة) : (قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح. قلنا: رجاله جميعهم ثقات، وسليمان بن عبيد: وهو السلمي البصري، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات). وقال الألباني في سلسة الأحاديث الصحيحة (رقم : 711) : (هذا سند صحيح رجاله ثقات) . وقال الدكتور عبد العليم البستوي في المهدي المنتظر (ص165 ط. دار ابن حزم) : (إسناده صحيح) ـ

আবু সাইদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার উম্মতের শেষভাগে মাহদীর আগমন ঘটবে। তার যমানায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে। যমিনে সর্বোচ্চ মাত্রায় ফলন হবে। তিনি (মানুষকে) সমানভাবে সম্পদ প্রদান করবেন। (তার শাসনামলে) গবাদি পশুর সংখ্যা বেড়ে যাবে। উম্মাহর বংশবৃদ্ধি ঘটবে। তিনি সাত বা আট বছর রাজত্ব করবেন।” -মুস্তাদরাকে হাকেম, ৮৬৭৩

হাদিসের মান:- হাফেয আবু আব্দুল্লাহ হাকেম, হাফেয যাহাবী, শায়েখ শুয়াইব আরনাউত, শায়েখ আলবানী ও ডক্টর আব্দুল আলীম হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। -মুসনাদে আহমদের টীকা, শায়েখ শুয়াইব আরনাউত, ১৭/২৫৫ সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহাহ, ৭১১ আলমাহদিউল মুন্তাযার, পৃ: ১৬৫

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحا» فقال له رجل: ما صحاحا؟ قال: «بالسوية بين الناس» قال: «ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى، ويسعهم عدله، حتى يأمر مناديا فينادي فيقول: من له في مال حاجة؟ فما يقوم من الناس إلا رجل فيقول أنا، فيقول: ائت السدان - يعني الخازن - فقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا، فيقول له: احث حتى إذا جعله في حجره وأبرزه ندم، فيقول: كنت أجشع أمة محمد نفسا، أو عجز عني ما وسعهم؟ قال: فيرده فلا يقبل منه، فيقال له: إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه، فيكون كذلك سبع سنين - أو ثمان سنين، أو تسع سنين». رواه أحمد: (11326) وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (رقم: 12393) : (رواه أحمد بأسانيد وأبو يعلى باختصار كثير، ورجالهما ثقات). وقال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم: 4001) : (رجاله ثقات رجال مسلم، غير العلاء بن بشير، وهو مجهول، كما في «التقريب». لكن قد توبع على بعضه عند الحاكم)ـ

قال الراقم عفا الله عنه: العلاء بن بشير قد وثَّقه ابن حبان، وقد حقَّق الشيخ عوامة : أن توثيق ابن حبان معتبر مثل توثيق غيره من الأئمة، وأن ما اشتهر عنه أنه يوثق المجاهيلَ غير صحيح، بل منهجه في ذلك منهج غيره من المحدثين المتقدمين مثل يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي وأبي داود وابن عدي وغيرهم، وهو أنهم يسبرون أحاديث الراوي، ثم يُوثِّقونه إذا لم يجدوا في أحاديثه ما يُستنكر. (راجع: تعليق الشيخ عوامة على «المصنف» لابن أبي شيبة: 1/77 - 101 ط. دار القبلة)

فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله لا سيما عند وجود المتابع والشاهد.

আবু সাইদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি তোমাদের মাহদীর সুসংবাদ দিচ্ছি। মুসলমানদের মাঝে অনৈক্য ও অস্থিরতার সময়ে আল্লাহ তায়ালা তাকে প্রেরণ করবেন। সে জুলুম-অত্যাচারে ভরা দুনিয়াকে আদল-ইনসাফ দ্বারা পূর্ণ করে দিবে। আসমান ও যমিনের অধিবাসী সকলেই তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। সে সমভাবে সম্পদ বিলি করবে। (তার সময়কালে) আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর প্রাচুর্যতায় পূর্ণ করে দিবেন। তার আদল-ইনসাফ সকলের ক্ষেত্রে ব্যাপৃত হবে। এমনকি ঘোষক ঘোষণা করবে, কারো সম্পদের প্রয়োজন আছে কি? তখন একব্যক্তি ব্যতীত কেউ উঠে দাঁড়াবে না। সে বলবে, আমার প্রয়োজন রয়েছে। ঘোষক বলবে, তুমি কোষাধ্যক্ষের কাছে গিয়ে বলো, আমাকে সম্পদ প্রদান করার জন্য মাহদী তোমাকে নির্দেশ দিয়েছে। কোষাধ্যক্ষ বলবে, তুমি হাত ভরে নাও। যখন সে কোষ ভরে সম্পদ নিয়ে তা কোলে রাখবে তখন সে অনুতপ্ত হয়ে বলবে, আমি তো উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে সবচেয়ে লোভী। তারা যা করলো আমি কেন তা করতে পারলাম না। তখন সে সেই সম্পদ ফিরিয়ে দিতে চাইবে। কিন্তু তা গ্রহণ করা হবে না। বলা হবে, আমরা সম্পদ প্রদান করার পর তা ফেরত নেই না। এমনিভাবে সাত, আট বা নয় বছর অতিবাহিত হবে।” -মুসনাদে আহমদ, ১১৩২৬

হাদিসের মান:- হাফেয নুরুদ্দীন হাইসামী রহ. বলেছেন, হাদিসের বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। -মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১২৩৯৩

ইমাম মাহদীর শাসনামলে মুসলমানদের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি

عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من خلفائكم خليفة يحثو المال حثيا، لا يعده عددا». صحيح مسلم (2914)۔

তোমাদের খলীফাদের মধ্যে একজন খলীফা এমন হবে, যে হাত ভরে ভরে দান করবে এবং মালের কোন গণনাই করবে না। -সহিহ মুসলিম, ২৯১৪ (৬/৩৯৫ ইফা.)

عن أبي سعيد، وجابر بن عبد الله، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده». صحيح مسلم (2914)۔

শেষ যমানায় একজন খলীফা হবে। সে হাত ভরে ভরে সম্পদ বিলি করবে। গণনা করবে না। -সহিহ মুসলিম, ২৯১৪ (৬/৩৯৫ ইফা.)

عن زيد العمي، عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يكون في أمتي المهدي، إن قصر فسبع وإلا فتسع، فتنعم فيه أمتي نعمة لم ينعموا مثلها قط، تؤتى أكلها، ولا تدخر منهم شيئا، والمال يومئذ كدوس، فيقوم الرجل فيقول: يا مهدي أعطني، فيقول: خذ».

رواه ابن ماجه (4083) وأحمد (11163) والترمذي مختصرا (2232) وقال : (هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال الجامع عفا الله عنه: وفي إسناده زيد العمي، وهو ضعيف، ولكن يشهد له ما أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5406) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يكون في أمتي المهدي، إن قصر فسبع وإلا فثمان وإلا فتسع، تنعم أمتي فيها نعمة لم ينعموا مثلها، يرسل السماء عليهم مدرارا، ولا تدخر الأرض شيئا من النبات، والمال كدوس، يقوم الرجل يقول: يا مهدي، أعطني، فيقول: خذ». قال الهيثمي في مجمع الزوائد (رقم: 12411) : (رجاله ثقات).

وقال الشيخ شعيب في تعليقه على سنن أبي داود: (6 : 343 ط. دار الرسالة العالمية) : (زيد العمي ضعيف لكنه متابع) ثم ذكر حديث أبي سعيد المار آنفا عند الحاكم، ثم قال : (6 : 344) (ويشهد للفظ زيد العمي تماما حديث أبي هريرة عند البزار (3326 - كشف الأستار)، والطبراني في الأوسط (5406)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1444) وإسناده حسن)۔

আবু সাইদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার উম্মাহর মাঝেই মাহদীর আগমন ঘটবে। তিনি কমপক্ষে সাতবছর, অন্যথায় নয় বছর রাজত্ব করবেন। তার আমলে আমার উম্মত এমন সুখ-স্বচ্ছন্দে বসবাস করবে যে সুখ তারা ইতিপূর্বে কখনো ভোগ করেনি। (ভূ-পৃষ্ঠের হাল এই হবে যে) তা সব ধরনের ফলমূল উৎপন্ন করবে। কিছুই আটকে রাখবে না। ধন-সম্পদ স্তুপকৃত করা থাকবে। লোকে দাঁড়িয়ে বলবে, হে মাহদী! আমাকে দিন। মাহদী বলবেন, (যত ইচ্ছা) নিয়ে যাও।" -সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪০৮৩ (৩/৫৪১ ইফা.) মুসনাদে আহমদ, ১১১৬৩ জামে' তিরমিযি, ২২৩২

হাদিসের মান:- এই হাদিসটির একজন রাবী 'যায়েদ আলআ'মা' যয়ীফ, তবে মু'জামে তবরানী ও অন্যান্য গ্রন্থে আবু হুরাইরা রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত একই অর্থবহ আরেকটি হাদিস রয়েছে। হাফেয নুরুদ্দীন হাইসামী ও শায়েখ শুয়াইব আরনাউত সেই হাদিসটির সনদকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তাই সেই হাদিসের সাথে মিলে আমাদের আলোচ্য হাদিসটি হাসান পর্যায়ে উন্নীত হয়। সম্ভবত এ কারণেই ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। -দেখুন, জামে তিরমিযি, ২২৩২ মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাফেয হাইসামী, ১২৪১১ সুনানে আবু দাউদের টীকা, শায়েখ শুয়াইব আরনাউত, ৬/৩৪৩

ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে মুসলমানদের তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়

عن حسان بن عطية، قال: مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان، وملت معهم، فحدثنا عن جبير بن نفير عن الهدنة قال:قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر -أو قال: ذي مخمر، الشك من أبي داود- رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتيناه، فسأله جبير عن الهدنة، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة (رواه أبو داود، 4292) وقال الشيخ شعيب في تلعيقه على سنن أبي داود : (6 : 351) : (إسناده صحيح) وزاد في رواية أحمد: (16826) : (فيأتونكم في ثمانين غاية، مع كل غاية عشرة) وقال الشيخ شعيب في تعليقه على مسند أحمد: (حديث صحيح)۔

وفي حديث طويل عن عوف بن مالك الأشجعي عند البخاري (3176) : (ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة، فيغدرون بكم، فيسيرون إليكم في ثمانين غاية، تحت كل غاية اثنا عشر ألفا)۔

হাসসান বিন আতিয়্যাহ রহ. বলেন, মাকহুল ও ইবনে আবু যাকারিয়া খালিদ বিন মা'দানের নিকট যান। আমিও তাদের সাথী হই। খালেদ আমাদেরকে জুবায়ের বিন নুফায়েরের সূত্রে সন্ধির ব্যাপারে হাদিস বর্ণনা করেন। (খালেদ বলেন) জুবায়ের (আমাকে উদ্দেশ্য করে) বলেন, তুমি আমাদেরকে নবীজির সাহাবী যু-মিখমারের কাছে নিয়ে চলো। তখন আমরা তার নিকট উপস্থিত হই এবং জুবায়ের তার নিকট সন্ধির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ বলতে শুনেছি, অচিরেই তোমরা রোমকদের সাথে শান্তিপূর্ণ সন্ধি করবে এবং তোমরা ও তারা সম্মিলিত হয়ে অপর এক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তোমরা সে যুদ্ধে বিজয়ী হবে, গণীমত লাভ করবে এবং নিরাপদে ফিরে এসে একটি টিলাবিশিষ্ট সবুজ-শ্যামল প্রসস্থ ভূমিতে অবতরণ করবে। তখন এক খৃষ্টান ক্রুশ উত্তোলন করে বলবে, ক্রুশ বিজয়ী হয়েছে! এতে এক মুসলিম ক্ষীপ্ত হয়ে ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবে। তখন খৃষ্টানরা গাদ্দারী করবে এবং বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিবে। -সুনানে আবু দাউদ, ৪২৯২

সহিহ বুখারীতে আওফ বিন মালেক রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, "অতপর তোমাদের মাঝে এবং রোমান (খৃষ্টানদের) মাঝে যুদ্ধ বিরতির চুক্তি সম্পাদিত হবে। কিন্তু তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং আশিটি পতাকা উত্তোলন করে তোমাদের মোকাবিলায় আসবে, প্রত্যেক পতাকাতলে বার হাজার সৈন্য থাকবে।" -সহিহ বুখারী, ৩১৭৬

নোট:- এ হাদিসদ্বয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও তাতে কাফেরদের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে, (১২০০০ ৮০ = ৯৬০০০০ নয় লাখ ষাট হাজার অর্থাৎ প্রায় এক মিলিয়ন) তবে এ যুদ্ধে কারা বিজয়ী হবে সে ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। তবে আমরা সবাই জানি, সে যুদ্ধে বিজয় মুসলমানদেরই পদচুম্বন করবে। পরবর্তী হাদিসে বিষয়টি

সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে।

عن أُسَير بن جابر، قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرى إلا: يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، قال: فقعد وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم، حتى لا يقسم ميراث، ولا يفرح بغنيمة، ثم قال: بيده هكذا - ونحاها نحو الشأم - فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام، ويجمع لهم أهل الإسلام، قلت: الروم تعني؟ قال: نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت، لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت، لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، وتفنى الشرطة، فإذا كان يوم الرابع، نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم، فيقتلون مقتلة - إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم ير مثلها - حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم، فما يخلفهم حتى يخر ميتا، فيتعاد بنو الأب، كانوا مائة، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح؟ أو أي ميراث يقاسم، فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس، هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ، إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم، ويقبلون، فيبعثون عشرة فوارس طليعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم، وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ - أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ -». صحيح مسلم: (2899)۔

উসায়র বিন জাবের রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার কুফা নগরীতে লাল উত্তপ্ত ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হলো। এ সময় এক ব্যক্তি কুফায় আসলো। তার মুদ্রাদোষ ছিল কোন কিছু ঘটলেই সে এসে বলতো, 'হে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ! কিয়ামত এসে গেছে!' (তো এই উত্তপ্ত ঝঞ্ঝা বায়ুর কারণেও সে অভ্যাস অনুযায়ী একই কথা বললো) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ হেলান দিয়ে বসেছিলেন। তার কথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না উত্তরাধিকার সম্পদ অবণ্টিত থাকবে এবং যতক্ষণ না লোক গণীমতে আনন্দিত হবে না। অতপর তিনি তার হস্ত দ্বারা শাম (সিরিয়া, জর্দান ও ফিলিস্তীন) এর প্রতি ইংগিত করে বললেন, আল্লাহর শত্রুরা জড়ো হবে মুসলামনদের সাথে লড়াই করার জন্য এবং মুসলমানগণও তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হবে। (এ কথা শুনে) আমি বললাম, (আল্লাহর শত্রু বলে) আপনার উদ্দেশ্য রোমান (খ্রীষ্টান) সম্প্রদায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং তখন ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। মুসলিম বাহিনী একটি দল অগ্রে প্রেরণ করবে, তারা মৃত্যুর জন্য সামনে অগ্রসর হবে (এ সিদ্ধান্ত নিয়ে যে) জয়লাভ করা ব্যতিরেকে তারা পেছনে ফিরবে না। এরপর তাদের মাঝে যুদ্ধ হবে। যুদ্ধ করতে করতে রাত হয়ে যাবে। অতপর উভয় পক্ষের সৈন্য জয়লাভ করা ব্যতিরেকেই ফিরে আসবে। যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের যে দলটি অগ্রে গিয়েছিলো তারা সকলেই শেষ হয়ে যাবে। পরবর্তী দিন মুসলিম বাহিনী মৃত্যুর জন্য একটি দল অগ্রে প্রেরণ করবে, তারা (সিদ্ধান্ত নিবে) বিজয় ব্যতীত প্রত্যাবর্তন করবে না। এদিনও তাদের মাঝে মারাত্মক যুদ্ধ হবে। অবশেষে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। উভয় বাহিনী জয়লাভ করা ব্যতীতই নিজ নিজ শিবিরে ফিরে আসবে। যে দলটি অগ্রে গিয়েছিলো তারা সকলেই শেষ হয়ে যাবে। তৃতীয় দিন পুনরায় মুসলমানগণ মৃত্যুর জন্য একটি বাহিনী পাঠাবে, যারা (সিদ্ধান্ত নিবে) বিজয়ী না হয়ে ফিরবে না। সে দিন পৃথিবীর সর্বোত্তম অশ্বারোহী দলের অন্তর্ভুক্ত হবে তারা। এ যুদ্ধ সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকবে। অবশেষে জয়লাভ করা ব্যতিরেকেই উভয় দল ফিরে আসবে। তবে মুসলিম বাহিনীর অগ্রবর্তী সেনাদলটি শেষ হয়ে যাবে। এরপর চতুর্থ দিবসে অবশিষ্ট মুসলমানগণ সকলেই যুদ্ধের জন্য সম্মুখ পানে এগিয়ে যাবে। সেদিন কাফিরদের উপর আল্লাহ তায়ালা পরাজয়-চক্র চাপিয়ে দিবেন। অতঃপর এমন যুদ্ধ হবে যা পৃথিবীতে কেউ কোন দিন দেখবেনা অথবা জীবনে কেউ কখনো দেখেনি। এমনকি (যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের) লাশের পাশ দিয়ে পাখী উড়ে যাবে। কিন্তু পাখী তাদেরকে অতিক্রম করার পূর্বেই মাটিতে পড়ে মরে যাবে। একশ মানুষ বিশিষ্ট একটি গোত্র থেকে মাত্র এক ব্যক্তি বেঁচে থাকবে। এমতাবস্থায় কেমন করে গনীমতের সম্পদ নিয়ে লোকেরা আনন্দ উৎসব করবে এবং কেমন করে উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন করা হবে?

মুসলমানগণ এ সময় আরেকটি ভয়াবহ বিপদের সংবাদ শুনতে পাবে। তাদের নিকট এ মর্মে একটি আওয়াজ আসবে যে, দাজ্জাল তাদের পেছনে তাদের পরিবার পরিজনের মধ্যে চলে এসেছে। এ সংবাদ শুনতেই তারা হাতের সমস্ত কিছু ফেলে দিয়ে রওয়ানা হয়ে যাবে এবং দশজন অশ্বারোহী ব্যক্তিকে সংবাদ সংগ্রাহক দল হিসাবে প্রেরণ করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দাজ্জালের সংবাদ সংগ্রাহক দলের প্রতিটি ব্যক্তির নাম, তাদের বাপ-দাদার নাম এবং তাদের অশ্বের রং সম্পর্কেও আমি অবগত আছি। এ পৃথিবীর সর্বোত্তম অশ্বারোহী দল সেদিন তারাই হবে। –সহিহ মুসলিম, ২৮৯৯ (৬/৩৮৩ ইফা.)

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ের পর মুসলমানদের তুরস্ক পর্যন্ত বিজয়াভিযান।

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة، من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا، قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا، والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم، أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث، لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم، قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون، وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال، يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، فأمهم، فإذا رآه عدو الله، ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لانذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده، فيريهم دمه في حربته». صحيح مسلم : (2897)۔

"কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না রোমান সেনাবাহিনী (সিরিয়ার) 'আ'মাক' বা 'দাবিক' নগরীতে অবতরণ করবে। তখন তাদের মুকাবিলায় মদীনা হতে এর পৃথিবীর সে যুগের সর্বোত্তম মানুষের এক দল সৈন্য বের হবে। উভয় দল যুদ্ধক্ষেত্রে সারিবদ্ধ হবার পর রোমানরা বলবে, তোমরা ঐ সমস্ত লোককে পৃথক করে দাও, যারা আমাদের লোকদের বন্দী করেছে। আমরা তাদের সাথে লড়াই করবো। তখন মুসলমানরা বলবে, আল্লাহর

শপথ! আমরা আমাদের ভাইদের থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হবো না। অবশেষে তাদের পরস্পর যুদ্ধ হবে। এ যুদ্ধে মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য পালিয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা কখনো তাদের তওবা কবুল করবেন না। এক-তৃতীয়াংশ নিহত হবে। তারা আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বোত্তম শহিদ বলে বিবেচিত হবে। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ বিজয়ী হবে। তারা আর কখনো ফিতনার শিকার হবে না। তারাই ইস্তাম্বুল জয় করবে। তারা নিজেদের তরবারি যায়তুন গাছে ঝুলিয়ে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ বণ্টন করতে থাকবে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে শয়তান চিৎকার করে বলতে থাকবে, দাজ্জাল তোমাদের পেছনে তোমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে চলে এসেছে। এ কথা শুনে মুসলমানরা সেখান থেকে বের হবে। অথচ এ ছিল মিথ্যা খবর (গুজব)। তারা শামে পৌঁছলে (বাস্তবেই) দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। যখন মুসলিম বাহিনী (দাজ্জালের সাথে) যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং সারিবদ্ধ হতে শুরু করবে তখন নামাযের জন্য ইকামাত দেওয়া হবে। অতপর ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন এবং (সালাতে) তাদের ইমামত করবেন। আল্লাহর শত্রু (দাজ্জাল) তাকে দেখামাত্রই বিগলিত হতে থাকবে যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। যদি ঈসা আলাইহিস সালাম তাকে এমনিই ছেড়ে দেন তবে সে বিগলিত হতে হতে ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা ঈসা আলাইহিস সালামের হাতে তাকে হত্যা করবেন এবং তার রক্ত ঈসা আলাইহিস সালামের বর্শাতে তিনি তাদেরকে দেখিয়ে দিবেন।" -সহিহ মুসলিম, ২৮৯৭ (৬/৩৮০ ইফা.)

হাদিসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা:-

এক. উল্লিখিত হাদিসসমূহে যদিও মাহদীর আলোচনা সুস্পষ্টরূপে নেই, তবে যেহেতু ইমাম মাহদী দাজ্জাল ও ইসা আলাইহিস সালামের পূর্বেই আসবেন, আর হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী ইস্তাম্বুল বিজয়ের পরেই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং তাকে হত্যার জন্য ইসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন, তাই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে শামের ময়দানে খৃষ্টানদের পরাজিত করার পর তুরস্কের ইস্তাম্বুল বিজয় পর্যন্ত যে ইমাম মাহদীই নেতৃত্ব দিবেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ কারণেই হাদিসের ভাষ্যকারগণ শেষোক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "হাদিসে বর্ণিত বাহিনী দ্বারা ইমাম মাহদীর বাহিনী উদ্দেশ্য।" (দেখুন, মিরকাত, মোল্লা আলী কারী, ৮/৩৪১২ দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রথম প্রকাশনা, ১৪২২ হি. বাজলুল মাজহুদ, ১২/৩৪২ মারকাযুয শায়েখ আবুল হাসান, ১৪২৭ হি. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৬/১৫২ দারুল কলম, প্রথম প্রকাশনা, ১৪২৭ হি. আলকাউকাবুল ওয়াহহাজ, দারুল মিনহাজ, প্রথম প্রকাশনা ১৪৩০ হি.)

দুই. শেষোক্ত হাদিসে যেহেতু বলা হয়েছে উক্ত বাহিনী মদীনা হতে বের হবে তো এ থেকে বুঝে আসে, তখন মক্কা-মদীনা সহ মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই ইমাম মাহদীর শাসনাধীন থাকবে। হাদিস থেকে আমাদের এমনই বুঝে আসছে, তবে ভবিষ্যতের বিষয়াদী সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই তায়ালাই সঠিক জানেন।

তিন. "রোমানরা বলবে, তোমরা ঐ সমস্ত লোককে পৃথক করে দাও, যারা আমাদের লোকদের বন্দী করেছে।" হাদিসের এ অংশের ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেছেন, এর দ্বারা খৃষ্টানদের উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদের ধোকা দিয়ে বিভক্ত করে ফেলা। তারা মুসলমানদের প্রতি মহব্বত প্রকাশ করে বলবে, তোমাদের সাথে তো আমাদের কোন শত্রুতা নেই। আমাদের শত্রুতা তো তাদের সাথে যারা আমাদের দেশে হামলা করেছে এবং আমাদের লোকদের বন্দী করেছে। তোমরা তাদেরকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো, তোমাদের কিছুই বলবো না। (দেখুন, মিরকাত, ৮/৩৪১২ তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৬/১৫৪)

হাদিসের এ অংশটি আমাদের জন্য বড়ই শিক্ষনীয়। কেননা কাফেররা সবসময়ই মুসলমানদের বিভক্ত করার জন্য এ ধরণের চক্রান্ত করে আসছে, যেমন বর্তমানে কাফেররা নাদান মুসলমানদের সাথে ধোকাবাজী করে তাদের বুঝাচ্ছে, 'তোমাদের সাথে তো আমাদের কোন শত্রুতা নেই। আমাদের শত্রুতা তো শুধু জঙ্গীদের সাথে, যারা আমাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি। আমরা শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধ করবো। তোমাদের কোন ক্ষতি করবো না।' বোকা মুসলিমরা তাদের এসব কথা মেনে নিয়েছে। বরং আরো একধাপ আগে বেড়ে তারাও এখন কাফেরদের সাথে ভালোবাসা-সম্প্রীতি গড়ে তোলা এবং এর মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি (?) প্রতিষ্ঠা করার দিবা-স্বপ্ন দেখছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা তাদের বারবার সতর্ক করে বলেছেন, 'কাফেররা কখনোই মুসলিমদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না।' 'তারা সর্বদা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতেই থাকবে, যতক্ষণ না মুসলিমরা তাদের ধর্ম থেকে ফিরে যায়।' 'তারা চায় তোমরাও কুফরী করো, যেমনিভাবে তারা কুফরী করেছে।' 'তারা তোমাদের ক্ষতি করতে কোন ত্রুটি করবে না। তোমাদের কষ্টই তাদের পছন্দনীয়। তোমরা তাদের মহব্বত করলেও তারা তোমাদের মহব্বত করে না।' 'সুযোগ পেলে তারা তোমাদের কচুকাটা করবে। এমনকি তোমাদের ব্যাপারে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক কিংবা কোন শান্তিচুক্তির পরোয়াও করবে না। ওরা মিষ্টি মিষ্টি বুলি দিয়ে তোমাদের মন ভুলায়, কিন্তু তাদের অন্তর তোমাদের মহব্বত করতে অস্বীকার করে।' (দেখুন, সূরা বাকারা, ১২০ ও ২১৭ সূরা আলে ইমরান, ১১৭-১১৮ সুরা নিসা, ৮৯ সুরা তাওবাহ, ৮ সুরা মুমতাহিনাহ, ২)

হায়, আফসোস, মুসলমানরা এত সুস্পষ্ট আয়াতগুলো কিভাবে ভুলে গেলো? আল্লাহর শপথ! যদি কোন দিন এই জঙ্গীরা শেষ হয়ে যায়, তাহলে কাফেররা মুসলমানদের পৃথিবীর বুক হতে নিশ্চিহ্ন করে দিবে। হয়তো তারা কৌশল হিসেবে ধীরে ধীরে এগোবে। কারণ তাদের ভয় থাকবে, তাড়াহুড়ো করলে মুসলিমরা ক্ষিপ্ত হয়ে আবারো জঙ্গী হয়ে যেতে পারে। কিন্ত আজ হোক বা কাল, তারা মুসলমানদের হত্যা বা ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করবেই।

চার. এখানে হাদিসের ভাষ্যকারগণ একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, ইস্তাম্বুল তো বর্তমান তুরস্কের রাজধানী, ৮৫৭ হিজরীতে উসমানী খলীফা মুহাম্মদ আলফাতেহ তা বিজয় করেছেন, তখন থেকে এ

পর্যন্ত তা মুসলিমদের হাতে রয়েছে, তাহলে পুনরায় তা বিজিত হওয়ার কি অর্থ?

এর উত্তরে আল্লামা তাকী উসমানী রহ. বলেছেন, কেয়ামতের পূর্বে পুনরায় ইস্তাম্বুল কাফেরদের হাতে চলে যাবে, তাই ইমাম মাহদী এসে তা বিজয় করবেন। (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৬/১৫৪) আমাদের মতে হাদিসের এ ব্যাখ্যার পাশাপাশি সম্ভাব্য আরেকটি ব্যাখ্যাও হতে পারে, তা হলো- যেহেতু তুরস্ক বর্তমানে সেক্যুলার আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, এমনকি ইসলামী পার্টির নেতা এরদোগানও ঘোষণা দিয়েছে, তুরস্ক সেক্যুলার রাষ্ট্র। তাই সেক্যুলার ধর্ম অনুযায়ী সে মদ ও যিনার লাইসেন্স বহাল রেখেছে। সমকামিতার জন্য কওমে লুতকে ধ্বংসকারী মহান আল্লাহর সাথে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে প্রকাশ্য সভায় সে ঘোষণা করেছে, "আমাদের সমকামীদের অধিকারের পক্ষে কথা বলতে হবে।" তাই হয়তো ইমাম মাহদী এসে এ ধরণের সেক্যুলার শাসকদের বিপক্ষে যুদ্ধ করে ইস্তাম্বুল জয় করবেন। ইতিপূর্বেও ইউসুফ তাশফীন, ইমাদুদ্দীন যিঙ্কি, নুরুদ্দীন যিঙ্কি, সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ও অন্যান্য ন্যায়পরায়ন মুসলিম শাসকগণ ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণার্থে জালেম ও ফাসেক শাসকদের থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন। ইউসুফ বিন তাশফীন রহ. পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত স্পেনের শাসকদের থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন। নুরুদ্দীন যিঙ্কী রহ. কাফেরদের সাথে আতাতকারী শাসক মুজিরুদ্দীন আতরক থেকে দিমাশক ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। একই কারণে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহ. হালাব দখল করেছিলেন। (দেখুন, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ১১/১২৯; ১১/২০৫; ১২/২১৭; ১২/২৮৯ দারুল হাদিস)

তেমনিভাবে তালেবান মুজাহিদগণ সোভিয়েতদের সাথে জিহাদকারী আফগান কমান্ডারদের থেকে জোরপূর্বক ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন, যারা সর্বত্র জুলুম-চাদাবাজী ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলো। আফগানিস্তানের উলামায়ে কেরাম বরং পুরো মুসলিম বিশ্বের সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ তাদের এ কাজকে সমর্থন করেছিলেন। সুতরাং কাফেরদের আজ্ঞাবহ দালাল ও মুরতাদ সেক্যুলার শাসকদের থেকে ইমাম মাহদী ক্ষমতা কেড়ে নিলে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

পাঁচ. শেষোক্ত হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এতই ভয়াবহ হবে যে, ইমাম মাহদীর বাহিনী হতে একতৃতীয়াংশ পলায়ন করবে, যাদের তওবা কখনোই কবুল হবে না। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের হাদিসের এই অংশটি গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। যারা এখন জিহাদ করছেন বা জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদেরও সতর্ক থাকা উচিত, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা উচিত। কারণ গুনাহ অনেক সময় জিহাদের ময়দান হতে পলায়নের কারণ হয়। উহুদের যুদ্ধে যারা পলায়ন করেছিলেন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا
(سورة آل عمران : 155)۔

উভয় বাহিনীর পারস্পরিক সংঘর্ষের দিন তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলো, প্রকৃতপক্ষে শয়তান তাদেরকে কিছু কৃতকর্মের কারণে পদস্খলনে লিপ্ত করেছিলো। -সুরা আলে ইমরান, ১৫৫

তাই আমরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করবো। পাশাপাশি জিহাদের ময়দানে অটল থাকার জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাদের যে দোয়াগুলো শিখিয়েছেন সেগুলোও গুরুত্বের সাথে নিয়মিত করবো । নিচের দোয়াগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হবো ইনশাআল্লাহ,

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
(سورة آل عمران: 147)۔

হে প্রভু! আমাদের গুনাহসমূহ এবং আমাদের দ্বারা আমাদের কার্যাবলীতে যে সীমালংঘন ঘটে গেছে তা ক্ষমা করে দিন। আমাদের দৃঢ়পদ রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয় দান করুন। -সূরা আলে ইমরান, ১৪৭

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (سورة البقرة 250)۔

হে প্রভু! আমাদের সবরের গুণ ঢেলে দাও এবং আমাদেরকে অবিচল-পদ রাখো আর কাফির সম্প্রদায়ের উপর আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান করো। -সূরা বাকারা, ২৫০

তেমনিভাবে সে মুসলিম ভাইদেরও ভেবে দেখা উচিত যারা ইমাম মাহদীর আসার অপেক্ষায় জিহাদ ও জিহাদের প্রস্তুতি হতে হাত গুটিয়ে বসে রয়েছেন এবং জোরগলায় বলছেন, ইমাম মাহদী আসলে আমরাও জিহাদ করবো। যদি মেনে নেই যে, ইমাম মাহদী আসলে আপনারা মুহুর্তে দুনিয়ার সব ব্যস্ততা ঝেড়ে ফেলে, মাহদীর সাহায্যার্থে ছুটে যেতে পারবেন, কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখুন, কোন ধরণের পূর্বপ্রস্তুতি ব্যতীত এভাবে জিহাদে গেলে যুদ্ধের ভয়াবহতায় আপনারা কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবেন। যে মাহদীর বাহিনী হতে এক তৃতীয়াংশ যোদ্ধা পলায়ন করবে আপনারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবার আশংকা নেই তো? আপনারা হয়তো মনে করছেন, মাহদী আসলেই ক্যারিশমাটিক ভাবে মুসলমানরা কোন বাধাবিপত্তি ব্যতীতই জয়ী হতে থাকবে। কিন্তু ইমাম মাহদীর ব্যাপারে এধরণের কোন অস্বাভাবিক কারামাত বা ক্যারিশমা আমরা সহিহ হাদিসে পাই না। বরং আমরা যে সহিহ হাদিসগুলো উল্লেখ করেছি, তা থেকে স্পষ্টরূপে বুঝে আসে যে, ইমাম মাহদী স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধ করেই পৃথিবী জয় করবেন। এমনকি চারদিন পর্যন্ত তার অগ্রবর্তী বাহিনীর সবাই শহিদ হয়ে যাবে। যুদ্ধের ভয়াবহতায় পুরো বাহিনীর এক তৃতীয়াংশ ময়দান ছেড়ে পালাবে। হাঁ, মুজেযা বা কারামাত শুরু হবে ইসা আলাইহিস সালামের অবতরণের পর, তিনি কাফেরদের দিকে তাকালেই তারা মরে সাফ হয়ে যাবে। তেমনিভাবে জিহাদের ময়দানে আল্লাহ তায়ালার গাইবী মদদ সবসময়ই থাকে, ইমাম মাহদীর সময়ও থাকবে, এখনোও রয়েছে, যদিও আপনারা বর্তমান মুজাহিদদের সাথে সংশ্লিষ্ট সে কারামাতগুলো বিশ্বাস করতে চান না।

ইমাম ছাড়া জিহাদ ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে

(দ্বিতীয় পর্ব, গাযওয়ায়ে যি-করদ)

আদনান মারুফ

ষষ্ঠ হিজরিতে মুসলিমরা হুদাইবিয়া থেকে ফিরে আসার পর গাতফান গোত্রের মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনী পাল লুট করার জন্য অতর্কিত আক্রমণ করে বসে এবং রাসূলের উটনীপাল নিয়ে পলায়ন করে। মহান সাহাবী সালামাহ বিন আকওয়া রাযি. এ আক্রমণের সংবাদ শুনে তাদের পিছু ধাওয়া করেন এবং একাই উটগুলো উদ্ধার করেন। সালামা ছিলেন দক্ষ তীরন্দাজ। তিনি তীর নিক্ষেপ করে করে মুশরিকদের বিপর্যস্ত করে ফেলেন। এরপর রাসূলের ঘোড়সওয়ার বাহিনী এসে মুশরিকদের উপর আক্রমণ করে। মুশরিকদের নেতা আব্দুর রহমান বিন উয়াইনাহ সহ আরো দুয়েকজন নিহত হয়। বাকী কাফেররা জিনিষপত্র ফেলে জান নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ইতিহাসে এ যুদ্ধ গাযওয়াতু যি-করদ নামে প্রসিদ্ধ। সহিহ বুখারী ও মুসলিমের হাদিসে এসেছে,

عن سلمة بن الأكوع، قال: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد، قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان، قال: فصرخت ثلاث صرخات، يا صباحاه، قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد، وقد أخذوا يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي، وكنت راميا، وأقول:ـ

أنا ابن الأكوع ... واليوم يوم الرضع

فأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم، واستلبت منهم ثلاثين بردة، قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت: يا نبي الله، إني قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة، فقال: «يا ابن الأكوع ملكت فأسجح»، قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. صحيح البخاري(3041 ، 4194) صحيح مسلم (1806، 1807)ـ

“সালামা ইবন আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ফজরের আযানের আগেই বের হয়ে পড়লাম। রাসুলুল্লাহ (সা) এর দুধেল উটনীগুলো তখন যু-কারদে (চারণ ভূমিতে) চরছিল। তখন আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রা.) এর গোলাম আমার সামনে পড়লো। সে বললো, রাসুলুল্লাহ (সা) -এর দুধেল উটনী সমূহকে নিয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে সেগুলো নিয়ে গেছে? সে বলল, গাতফান গোত্রের লোকেরা। সালামা বলেন, তখন আমি উচ্চস্বরে তিনবার হাঁক দিলাম, সাহায্য চাই, সাহায্য। মদীনার উভয় প্রান্তের মধ্যবর্তী সবাইকে আমি আমার সে হাঁক শোনালাম।

তারপর সোজা বেরিয়ে পড়লাম এবং যু-কারদে গিয়ে তাদের (লুটেরাদের)-কে পেলাম। তারা তাদের পশুদেরকে পানি পান করাচ্ছিল। তখন আমি তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলাম। আমি ছিলাম একজন (দক্ষ) তীরন্দাজ। আমি বীরত্ব সূচক কবিতা আবৃতি করছিলাম, 'আমি আকওয়ার পুত্র, আজ ইতরদের ধ্বংসের দিন (কিংবা আজ তার দিন, যে শৈশব থেকে যুদ্ধের স্তন্য পান করেছে)।

আমি আমার তীর নিক্ষেপ ও বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা আবৃতি করতে থাকলাম। অবশেষে আমি দুধেল উটনীগুলো মুক্ত করলাম। এমনকি আমি তাদের ত্রিশটি (বড়) চাদরও ছিনিয়ে নিলাম। এমন সময় রাসুলুল্লাহ (সা) ও লোকজন এসে পড়লেন। তখন আমি বললাম, "ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি তাদের পানির পথ রুদ্ধ করে রেখেছি, তাই তারা পিপাসার্ত। এবার আপনি একটি বাহিনী প্রেরণ করুন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সালামা! তুমি ওদের উপর বিজয়ী হয়েছো। এবার ওদের প্রতি দয়া করো। সালামা (রা.) বলেন, তারপর আমরা ফিরে এলাম। রাসুলুল্লাহ (সা) আমাকে তাঁরই উটনীর পিছনে বসিয়ে নিলেন। এভাবে আমরা মদীনায় পৌঁছলাম। -সহিহ বুখারী, ৩০৪১; ৪১৯৪ সহিহ মুসলিম, ১৮০৬ (ইফা, ৪/৩৪৫-৩৪৬)

সহিহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, সালামা বিন আকওয়া আক্রমণের কথা জানতে পেরে রাসূলের নিকট সংবাদ পাঠান এবং তিনবার ঘোষণা প্রদান করে মুশরিকদের পিছু ধাওয়া করেন। পরদিন ভোর হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাদের আজকের উত্তম অশ্বারোহী ছিলো আবু কাতাদাহ্ এবং উত্তম পদাতিক ছিলো সালামা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামাহ বিন আকওয়াকে গনিমত হতে দুটি অংশ প্রদান করেন, ঘোড়সওয়ারের অংশ এবং পদাতিকের অংশ।" –সহিহ মুসলিম, ১৮০৭

এ যুদ্ধ ইমামের অনুমতি ব্যতীত জিহাদ বৈধ হওয়ার সুস্পষ্ট দলিল। কেননা সালামা বিন আকওয়া রাযি. আক্রমণের সংবাদ পাওয়ার পর নবীজির অনুমতি নেওয়ার অপেক্ষা করেননি। বরং তিনি নবীজির কাছে সংবাদ প্রেরণ করেছেন। পাহাড়ে উঠে তিনবার হামলার ব্যাপারে সতর্ক করে ঘোষণা দিয়েছেন। এরপরই শত্রুর পিছে ধাওয়া শুরু করেছেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্য তার কোন নিন্দা করেননি। বরং তার বীরত্বমূলক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নিজের পেছনে বসিয়ে মদীনায় নিয়ে এসেছেন। তার প্রশংসা করে বলেছেন, "আজকের যুদ্ধে আমাদের সর্বোত্তম পদাতিক সৈন্য হলো সালামাহ।" পুরস্কারস্বরূপ তাকে দিগুণ গনিমত প্রদান করেছেন। এজন্যই বিশিষ্ট আলেমগণের বোর্ড কর্তৃক সংকলিত ফিকহে ইসলামীর বে-নজির কিতাব 'মওসুয়াহ ফিকহিয়্যাহ'য় শত্রু আক্রমণের সময় ইমামের অনুমতি ব্যতীত জিহাদ বৈধ হওয়ার দলিল স্বরূপ এ হাদিস পেশ করা হয়েছে, মওসুয়াহর ইবারত দেখুন,

صرح الشافعية والحنابلة بأنه يكره الغزو من غير إذن الإمام أو الأمير المولى من قبله ؛ لأن الغزو على حسب حال الحاجة ، والإمام أو الأمير أعرف بذلك ، ولا يحرم . ؛ لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس ، والتغرير بالنفس يجوز في الجهاد ولأن أمر الحرب موكول إلى الأمير ، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ، ومكامن العدو وكيدهم ، فينبغي أن يرجع إلى رأيه ؛ لأنه أحوط للمسلمين ؛ ... إلا أن يفجأهم عدو يخافون تمكنه، فلا يمكنهم الاستئذان، فيسقط الإذن باقتضاء قتالهم، والخروج إليهم لحصول الفساد بتركهم انتظارا للإذن.

ودليل ذلك أنه لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم صادفهم سلمة بن الأكوع خارجا من المدينة فتبعهم وقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع ، وأعطاه سهم فارس وراجل الموسوعة الفقهية الكويتية (16/ 136 وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت الطبعة : من 1404 - 1427 هـ)۔

"শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ সুস্পষ্টরূপে বলেছেন, ইমাম বা ইমামের প্রতিনিধির অনুমতি ব্যতীত জিহাদ করা মাকরুহ বা অপছন্দনীয়, হারাম নয়। কেননা জিহাদ করতে হয় প্রয়োজন অনুপাতে। আর এ ব্যাপারে ইমামই সম্যক অবগত। তবে তা হারামও হবে না। কেননা এতে বেশি থেকে বেশি নিজেকে বিপদে ফেলা হয়। আর জিহাদের ক্ষেত্রে নিজের জানকে বিপদের সম্মুখীন করা বৈধ। তাছাড়া যুদ্ধের বিষয়াদি আমিরের নিকট ন্যস্ত। শত্রুদের সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যাসল্পতা, তাদের গোপন ঘাটি ও চক্রান্ত ইত্যাদি সম্পর্কে তিনিই ভালো জানেন। তাই তার মতানুযায়ী জিহাদ করা উত্তম এবং মুসলমানদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহায়ক।

তবে যদি এমন শত্রু হঠাৎ আক্রমণ করে বসে যাদের ঘাটি গেড়ে বসার আশংকা রয়েছে, বিধায় অনুমতি নেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে শত্রুদের যুদ্ধের কারণে অনুমতি নেওয়ার হুকুম রহিত হয়ে যাবে। এর দলিল হলো, যখন কাফেররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনীর উপর আক্রমণ করে তখন সালামা বিন আকওয়া তাদের পিছু ধাওয়া করেন এবং ইমামের অনুমতি ব্যতীতই তাদের সাথে যুদ্ধ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ কাজের প্রশংসা করে বলেন, আজ আমার পদাতিক সৈন্যদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো সালামা বিন আকওয়া এবং তাকে ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক সৈন্য উভয়ের সমান গনিমত প্রদান করেন। -মওসুয়াহ ফিকহিয়্যাহ, ১৬/১৩৬

ক্ষমা করতে শিখুন

abu musa

একজন আর্দশ মুমিন তার ভাইকে ক্ষমা করে দেয়, কখনো মনে ক্ষোভ চলে এলেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। ক্ষমা করার বিনিময় সে আল্লাহ তায়ালার কাছে ছাওয়াবের আশা রাখে। যারা আপন ভাইয়ের দোষ ক্ষমা করে আল্লাহ তায়ালা তাকে ভালবাসেন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالكاظِمِينَ الغَيض وَالعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ المُحسِنِينَ

“যারা নিজেদের রাগ সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে তারা সৎকর্মশীল আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন” (সুরা আলে ইমরান ৩:১৩৪)

আনেক সময় মানুষ রাগকে সংবরণ করে ফেলে, কিন্তু হিংসা বিদ্বেষের আগুন তার হৃদয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে, যা পরে শত্রুতার পরিণত হয় প্রকাশ্য রাগ পরিণত হয় গোপন বিদ্বেষ। অথচ শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষের চেয়ে রাগ তুলনা মূলক ভালো। প্রকৃত মুসলিম রাগ সংবরণ করার সাথে সাথে, ভাইকে ক্ষমাও করে দেয়। ফলে তার ভিতর হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা বাসা বাঁধতে পারে না।

প্রিয় ভাই! আপনি যখন রেগে যান তখন আপনার মনের উপর একটি ভারি বোঝা চেপে বসে। এবং ক্ষোধের আগুন আপনার ভিতরটাকে পুড়িয়ে ফেলতে চায়,কিন্তু আপনি যদি উদার মনে আপনার ভাইকে ক্ষমা করে দেন, তবে আপনার মন এমনিতেই হালকা হয়ে যায় আপনার মনে প্রশান্তি ফিরে আসবে।

হাদিসে মুমিন ভাইকে ক্ষমা করে দেওয়ার অনেক ফজিলত এসেছে সহিহ মুসলিমে রসূল (সা:) ইরশাদ করেন,

وَمازَادَاللّٰهُ عَبدًابَعفوٍ الّاعِزًا وَمَاتَوَاضَعَ أَحَدٌللّٰه إلّا رَفَعَهُ اللّٰهُ

কেউ কাউকে ক্ষমা করে দিলে তাঁর বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সম্মান বাড়িয়ে দেন এবং কেউ কারও প্রতি আল্লাহর জন্য বিনয় প্রদর্শন করলে আল্লাহ তায়ালা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। (মুসলিম ২৫৮৮)

একজন আদর্শ মুমিনের অন্তরে হিংসা বিদ্বেষের কোন স্থান নেই,আল্লাহর ক্ষমাও ভালবাসা পাওয়ার জন্য, সে উদার মনে তাঁর মুমিন ভাইদেরকে ক্ষমা করে দেয়। মুসলিম ভাইয়ের দেওয়া কষ্ট অকাতরে সহ্য করে, আখেরাতে পুরষ্কারের আশায় সবর করে, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إنَّ ذَلِكَ لَمِن عَزمِ الأُمُورِ

আর যে সবর করে এবং ক্ষমা করে তা-নিশ্চয় দৃঢ়সংকল্পের কাজ। (সুরা শুরা ৪২ : ৪৩)

প্রিয় ভাই! কত দিনের-ই বা দুনিয়া কখন কার ডাক এসে যায় বলা তো যায় না। কেন আপনি একজন ভাইয়ের প্রতি অনর্থক রাগ পুষে রাখবেন, সবাইকে উদার মনে ক্ষমা করে দিন। নিজেকে ভার মুক্ত করুন,আপনার মুমিন ভাইদের প্রাণ ভরে ভালোবাসুন। আল্লাহ তায়ালা সকল মুমিন ভাইকে ক্ষমার গুণ অর্জন করার তাওফিক দিন, মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও হৃদ্যতা সৃষ্টি করে দিন ইয়া রব্বাল আলামিন।

সংশয় নিরসন

গণতন্ত্র একটি মশওয়ারার মাধ্যম

আলী ইবনুল মাদীনী

হাকিমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন:-

কিছু কিছু মানুষ অনেক চেষ্টা করে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে ইসলামি বানাতে ব্যর্থ চেষ্টা করে। ফলে তারা মূর্খের পরিচয় দিয়ে থাকে। তারা প্রমাণ হিসাবে কোরআনের একটা আয়াত পেশ করে থাকে। তাদের দলিল আল্লাহ তা'আলা বলেন :-

وَ شَاوِرْهُمْ فِي الاَمْر

“আর তাদের নিকট হতে বিশেষ বিশেষ ব্যপারে পরামর্শ নিতে থাকুন। কিন্তু তাদের এ প্রামাণ্য দলিলের স্থান নিতান্তই ভূল। তারা মশওয়ারার বিষয়গুলোকেই মশওয়ারার মাধ্যমে বাতিল করে দেয়। আর ইসলামে যে সকল বিষয়ে মশওয়ারার সুযোগ দিয়েছে,” এর মধ্যে কোনটিরই মধ্যে গণতন্ত্রকে ধরা যায় না।

যে আয়াত দ্বারা তারা ইসলাম ধর্মে গণতন্ত্রের প্রমাণিকতা খুজে পায় সেই আয়াতের শেষাংশেই গণতন্ত্রকে ইসলাম বহির্ভুত জিনিস হিসাবে উল্লেখ করা আছে। কিন্তু তারা আয়াতের এক অংশের উপর আমলের দাবি করতে গিয়ে আয়াতের অন্য অংশকে বাদ দিয়ে দেয়। নিচে পুরা আয়াত লেখা হল। আয়াত :-

وَ شَاوِرْهم فِي الاَمر،عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلى اللّٰه،اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয় আল্লাহ এমন ভরসাকারীদেরকে ভালোবাসেন। সূরা ইমরান-১৫৯

আয়াতের ব্যাখ্যা :- এখানে বিশেষ ব্যপার বলতে,যে সমস্ত বিষয়ে রাসূল (স:) উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ওহী আসে নাই সে সকল বিষয়ে পরামর্শ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু যে সকল বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী এসেছে সে সকল বিষয়ে পরামর্শ করতে বলা হয় নাই। কারণ ওহী আসার পরে সে সকল বিষয়ের উপর পরামর্শ করার কোন সুযোগ নেই।

এখানে রাষ্ট্র চালান বা আইন প্রনয়নের সময় অধিকাংশের কথা ধর্তব্য হবে, এটা উদ্দেশ্য নয়। কেননা এটা উদ্দেশ্য হলে, عزم বা সিদ্ধান্ত নেওয়া শব্দ না বলে বরং বলা হত আপনার রায় যেন অধিকাংশের বিরোধী না হয়।

এখানে তাওয়াক্কুল শব্দের বিভিন্ন উদ্দেশ্য হতে পারে।

মশওয়ারা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথার পরে আল্লাহ তা'আলা তিনার উপর ভরসা করার কথা বলেছেন। যাতে করে মানুষে বুঝতে পারে মশওয়ারা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের একই অর্থ। কেননা মশওয়ারা এবং সিদ্ধান্ত ফয়সালার মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর ফয়সালার পরে আল্লাহর উপর ভরসা করা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য জরুরি।

আর যদি ফয়সালা শব্দকে তাওয়াক্কুল শব্দের বিরোধী ধরা হয়,তাহলে ব্যখ্যা হবে,দ্বীনি ফয়সালা অমান্য করা গুনাহ আর দুনিয়াবি অকট্য ফয়সালা অমান্য করা না জায়েজ। আর সন্দেহ মূলক প্রধান্য দিতে পারলে জায়েজ আর প্রাধান্য দিতে না পারলে তরক করতে পারে।

এছাড়া মুফতী শফী রহিমাহুল্লাহ তিনার মা'আরেফুল কুরআনে বলেন :- বর্তমানে গণতন্ত্রের যে অধিকাংশের রায় অনুযায়ি নেতা হয় সেটাই জুলুম অত্যাচারের পন্থা। সুতরাং তারা ক্ষমতায় এসে কিভাবে ইসলামি আইন কায়েম করবে?তারা এতটাই বদমেজাজি ও বিকৃত মানসিকতার হয় যার ফলে আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, সকল মানুষের রব,এবং আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত হুকুমত ও রাজত্বের কথা মনেই করে না। বরং তারা মনে করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নেতা হওয়াকেও আল্লাহ তা'আলার দান মনে করে।

সার কথা হল, মশওয়ারা করতে হবে, যে সকল বিষয়ে শরিয়তের হুকুম আছে সেগুলোকে কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায়? কিন্তু মশওয়ারার মাধ্যমে শরিয়তের মধ্যে কোন পরিবর্তন করা যাবে না।

"জিহাদ ঈমানের একটি অংশ।" -ইমাম বোখারী

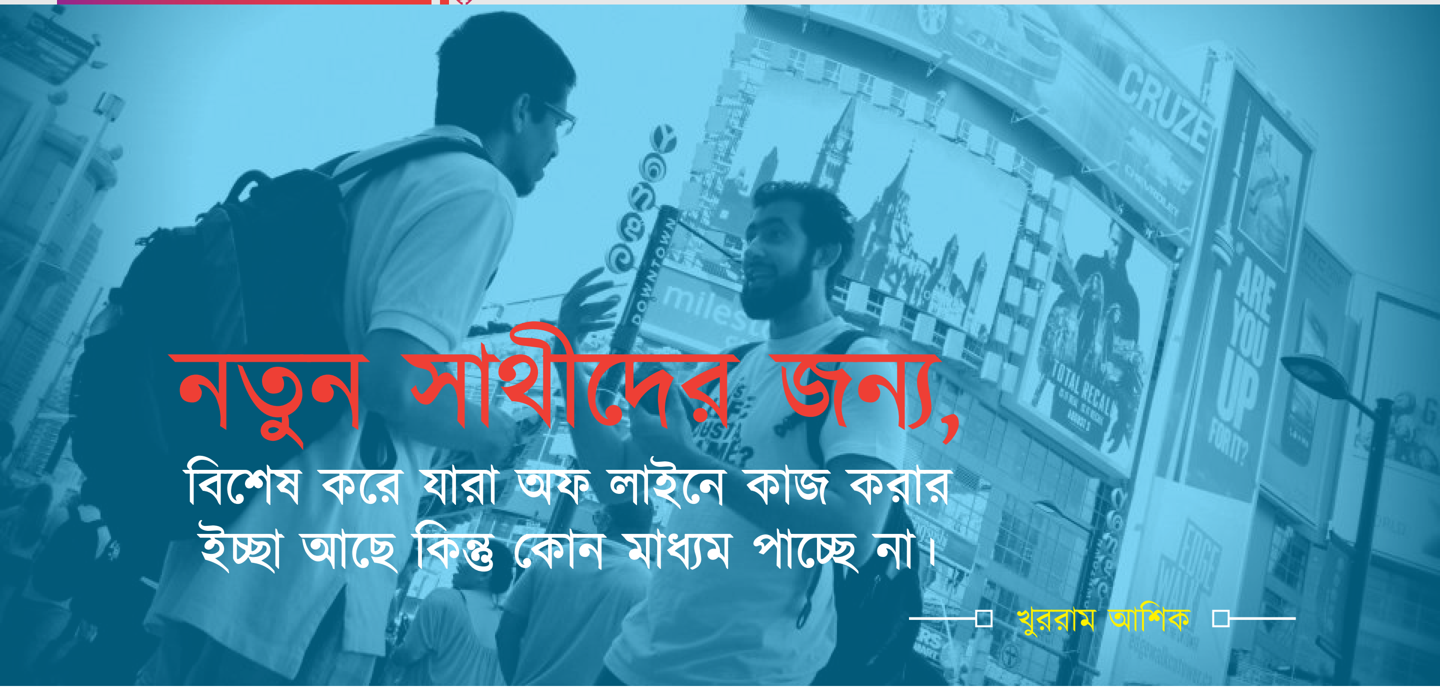

নতুন সাথীদের জন্য,

বিশেষ করে যারা অফ লাইনে কাজ করার ইচ্ছা আছে কিন্তু কোন মাধ্যম পাচ্ছে না।

খুররাম আশিক

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

প্রিয় ভাইয়েরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আর সব সময় ভালো থাকুন এটাই চাই, ও দুয়া করি। আমাদের বন্দী ভাইদের জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া করি আল্লাহ যেনো ভাইদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন, আমীন। আল্লাহ যেনো ভাইদের মনে শক্তি সাহস বাড়িয়ে দেন, যাতে করে ভাইয়েরা ত্বাগুতের বিভিন্ন কূটকৌশল বুঝতে পারেন, আমীন।

প্রিয় নতুন ভাইয়েরা, আমরা যারা বিভিন্নভাবে ফোরামে এসেছি, বা কাজ করতে আগ্রহী। প্রিয় ভাইয়েরা, প্রথমেই আপনাদের বলব আপনারা সিকিউরিটি বজায় রেখে চলুন। আমরা অনেকে আছি ইউটিউবে কমেন্ট করি এক্ষত্রে খুব সাবধানে আমাদের চলা উচিত। ইউটিউবে হয়ত কেও ফোরামের কথা বলল আর আপনি আবেগেরছলে একটা কমেন্ট করে দিলেন, আর ত্বাগুত পুরো শক্তি নিয়ে আপনাকে খুজতে নেমে পড়লো, তারপর খুজে পেয়ে গেলো, তারপরের অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন, আপনি যতই বলেন আমি কাউকে চিনি না, ত্বাগুত কিন্তু আপনার কথার শোনবে না। তারা আপনার সামনে বিশাল এক ডায়েরি ধরে দিবে যাদের যাদের চিনেন তাদের নাম ঠিকানা বিস্তারিত বলার জন্য তখন মহা মুশকিলে পড়ে যাবেন। কাজেই ছোটখাটো কাজ করা থেকে নিজেদের বিরত রাখুন।

প্রিয় ভাইয়েরা, আপনারা আমাদের ভাই, আর আল্লাহ কুরআনে ভাই ই বলেছেন, মুমিন মুমিনের ভাই। যেমন বন্ধুর বিপরীত শব্দ শত্রু, কিন্তু ভাইয়ের বিপরীত শব্দ হয় বোন, দুটিই রক্তের সাথে সম্পর্কের সাথে মিল আছে। তাই ভাইই বলা ভালো। প্রিয় ভাইয়েরা, ফোরাম তথা জিহাদী/ত্বাগতের আইনে নিষিদ্ধ সাইটগুলো ব্রাউজ করুন টর ব্রাউজার দিয়ে। টর ব্রাউজার ছাড়া অন্য কোন ব্রাউজার দিয়ে জিহাদী সাইটগুলো ব্রাউজ করবেন না।

প্রিয় নতুন ভাইয়েরা, আপনারা উন্মুখ হয়ে আছেন জিহাদে বের হওয়ার জন্য, কিন্তু কোন মাধ্যম পাচ্ছেন না, আপনাদের জন্য এ-ই ফোরামই হলো মাধ্যম। আপনারা নিরাপত্তার সাথে নিয়মিত ফোরামে আসুন, ফোরামের পোস্টগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে বলুন। অন্যকে পড়তে বলার ক্ষেত্রে অবশ্যই নিজের নিরাপত্তার কথা স্বরণ রাখুন, কারণ আমরা কখনোই চাই না আপনি গ্রেফতার হয়ে জেলে যান। কাজেই যাকে তাকে বলা যাবে না। যেই ব্যক্তি ফোরামের আদর্শের বিরুদ্ধে তাকে ফোরাম পড়ার জন্য বলছেন মানে হচ্ছে আপনি আপনার নিউজ পুলিশকে দিচ্ছেন। আর পুলিশ জানতে পারলে সে আপনার ইনফু দিয়ে তার চাকরির প্রমোশন করিয়ে নিবে নিশ্চিত। সে ত্বাগুতের পক্ষ থেকে স্বর্ণের পদক পাবে। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখার জন্য।

আমরা কয়েকটি মূলনীতি নিয়ে সামনে এগুবো।
১/ তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত।
২/ ইসলাম/মুসলিম।
৩/ ওয়ালা বারা। (মোহাব্বত, বাগাওয়াত)
৪/ ইনসানিয়্যা।
৫/ সুন্নাহ।
৬/ জিহাদ।

আকিদার বিষয়গুলো জানার জন্য, বুঝার জন্য আমল করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই ইলম অর্জন করতে হবে। ইলম অর্জন ছাড়া বিকল্প নেই। তাই আমরা আকিদার বিষয়গুলো ভিজ্ঞ উলামাদের নিকট থেকে জেনে নিবো,এবং নিজেরাও কিতাবাদি অধ্যয়ন করবো। আদর্শবান উস্তাদ ছাড়া সঠিক ইলম পাওয়াও আজকাল মুশকিল ব্যাপার। আদর্শবান উস্তাদ নিজেরাই খুজে নিবো। কারো তাওহীদ ঠিক হয়ে গেলে তাকে খুব সহজেই জিহাদ বুঝানো সম্ভব। জিহাদ না বুঝার জন্য প্রধান সমস্যাই হচ্ছে আকিদা/তাওহীদ না বুঝা।

(ইসলাম/মুসলিম) আমাদের কাজের ক্ষেত্রে মুসলিম শব্দটি খুব ভালো করে জেনে নিতে হবে। কাকে মুসলিম বলে, কে মুসলিম নয়। আমরা খুব ভালো করে জেনে নিবো কে আসলে মুসলিম, তাহলে কাজের জন্য খুব সহজ হবে। আজকাল মুসলিমদেরকে টার্গেট করে কিছু লোকেরা আন্দোলন করছে, কিন্তু আশানোরুপ ফলাফল আসছে না। যেই বিদ্বেষ রাখার কথা ছিলো কাফেরের প্রতি সেই বিদ্বেষ রাখছি মুসলিমেরপ্রতি, ফলে আমাদের কাজ এগুচ্ছে না। এ বিষয়টি সামনে রাখতে হবে অবশ্যই। একজন মুসলিম তাকে আমি কিসের দাওয়াত দিবো? মুসলিমকে ইছলাহ/ আমলের দাওয়াত দিবো। কিন্তু জীবনের সময় টুকু মুসলিমকে কেন্দ্র করে কেটে যাচ্ছে। আমি আছি আরো আমলের উপর মুসলিমদের ওঠাতে কিন্তু ত্বাগুত মুসলিমের মূল কেটে দিচ্ছে। একজন মুসলিম কিভাবে আমার শত্রু হবে? সে তো হলো আমাদের ভাই। আমরা যেই শাহাদা বাক্য পড়ে মুসলিম হয়েছি সে তো একই শাহাদাহ পড়ে মুসলিম হয়েছে। আমরা কি এখনো পেরেছি মুসলিম হিসেবে বিশ্বের সমস্ত মুসলিমদের ভাই হিসেবে মেনে নিতে? আমরা পারেনি। মুসলিম সে আমার ভাই, আল্লাহ কুরআনে বলেছেন মুসলিম/মুমিন মুমিনের ভাই। ভাই কীভাবে আরেক ভাইকে দূরে ঠেলে দিতে পারে? আমরা যদি এই মানহাজটুকু ঠিক করতে পারি তাহলে বিশ্ব আমাদের হয়ে যাবে। মুসলিম সে যেখানেরই হউক সে আমার ভাই। আমার আপন ভাই কোন বিপদে পড়লে যেমন দৌড়ে যায় ঠিক তেমনি কোন মুসলিম ভাই বিপদে পড়লে আমাদের দৌড়ে তার কাছে যেতে হবে। সাধ্যানুযায়ী তার পাশে দাড়াতে হবে। এই একটা বিষয়।

আমাদের রব বলেছেন মুমিন মুমিনের ভাই, কিন্তু ভাইকে ভাইয়ের মর্যাদা দিচ্ছি না। ভাইয়ের দোষ চর্চায় লিপ্ত তাহলে আমাদের বিজয় আসতে পারে? এভাবে প্রত্যেক মুমিনই যদি মুমিনকে ভাই হিসেবে কদর করে তাহলে পুরো বিশ্ব আমাদের হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু আজকে জাতীয়তাবাদের করালগ্রাসে ভেসে গেছে সেই চেতনা। ফলে আমরা হয়ে গেছি ভাসমান ময়লার আবর্জনার মতো। আজকে আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা মহা বিপদের সম্মুখীন কিন্তু আমাদের কোন ফিকির নেই। তারা নির্ঘুম রাত্র পার করছে, আমরা ২৪ ঘন্টা ঘুমাচ্ছি। এক হাদিসে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কোন মুসলিম তার ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র থাক করল সে আমার উম্মত নয়। কিন্তু আমাদের অনেক মুসলিম ভাই মুসলিম কেন্দ্রিক আন্দোলন করছে। ফলে কাফেরদের দালালরা নামধারী মুসলিমদের মাধ্যমে আমাদের উপর জুলুম নির্যাতন চালু রেখেছে। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম সমস্ত মুসলিম আমাদের ভাই, তাদের সাথে ভাইয়ের মতো আচরণ করতে হবে, আর এটি ফরজ। ভাইয়ের সাথে ভালো আচরণ করা, ভাইকে ভালোবাসা, ভাইয়ের বিপদে পাশে দাড়ানো। ভাইয়ের বদনাম না করা। কোন মুসলিমের সাথে খারাপ আচরণ না করা। সমাজে চলতে ফিরতে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা যেনো মুসলিম ভাই কষ্ট না পায়। স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় ছাত্র ভাইদের সাথে খুব ভালো আচরণ করা যাতে করে সে আপনার কাছে ভিড়ে। আপনার আদর্শ মানহাজ গ্রহণ করে।

চলবে ......

যুদ্ধের ময়দানে উচ্চস্বরে তাকবিরের বিধান

ইলম ও জিহাদ

এক ভাই একটি প্রশ্ন করেছেন, যার সারমর্ম- মুজাহিদ ভাইয়েরা অপারেশন চলাকালে আল্লাহু আকবার তাকবির দিয়ে থাকেন বা জিকির করে থাকেন বা অন্যান্য কথাবার্তা বলে থাকেন। অথচ কোনো কোনো হাদিসে যুদ্ধের ময়দানে চুপ থাকার নির্দেশ এসেছে এবং উচ্চস্বরে আওয়াজ অপছন্দ করা হয়েছে। তাহলে মুজাহিদগণের এ আমলের কি জওয়াব হবে?

উত্তর :-

যেসব হাদিস বা আসারে জিহাদের ময়দানে আওয়াজ করাকে অপছন্দনীয় বলা হয়েছে, সেগুলোতে বে-ফায়েদা হৈ-হুল্লোর উদ্দেশ্য। তাকবির, তাহলিল, আল্লাহ তাআলার যিকির বা প্রয়োজনীয় আওয়াজ নিষিদ্ধ নয়। বরং জিহাদের ময়দানে আল্লাহ তাআলার যিকির করতে আল্লাহ তাআলা নিজেই আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন বাহিনির সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহ তাআলাকে অধিক পরিমাণে স্বরণ করতে থাক, যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার।” (আনফাল: ৪৫)

ইমাম জাসসাস রহ. বলেন,

وقوله تعالى: {واذكروا الله كثيرا} يحتمل وجهين: أحدهما: ذكر الله تعالى باللسان، والآخر: الذكر بالقلب، وذلك على وجهين: أحدهما: ذكر ثواب الصبر على الثبات لجهاد أعداء الله المشركين وذكر عقاب الفرار؛ والثاني: ذكر دلائله ونعمه على عباده وما يستحقه عليهم من القيام بفرضه في جهاد أعدائه. وضروب هذه الأذكار كلها تعين على الصبر والثبات ويستدعى بها النصر من الله والجرأة على العدو والاستهانة بهم. وجائز أن يكون المراد بالآية جميع الأذكار لشمول الاسم لجميعها. اهـ

“আল্লাহ তাআলার বাণী- ‘এবং আল্লাহ তাআলাকে অধিক পরিমাণে স্বরণ করতে থাক’

এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে:
এক. মুখে আল্লাহ তাআলার যিকির করা।
দুই. অন্তরের যিকির।

এই সব ধরণের যিকির অটল অবিচল থাকতে সহায়ক হবে। আল্লাহ তাআলার নুসরত লাভ এবং শত্রুর উপর দুঃসাহসিকতা দেখানো ও তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করার মাধ্যম হবে।

আয়াতের দ্বারা সব ধরণের যিকিরই উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, যিকির শব্দ সব ধরণের যিকিরকেই বুঝায়।” (আহকামুল কুরআন: ৩/৮৬)

অতএব, মনে মনে যেমন আল্লাহ তাআলাকে স্বরণ করবে, মুখে মুখেও আল্লাহ তাআলার যিকির করবে। এর দ্বারা দৃঢ়তা পয়দা হবে। ময়দানে টিকে থাকা সহজ হবে। অন্য মুমিনদের অন্তর শক্তিশালী হবে।

খায়বারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাকবীর ধ্বনি দিয়েছেন- الله أكبر خربت خيبر ‘আল্লাহু আকবার! খায়বারের ধ্বংস সুনিশ্চিত’।
-সহীহ বুখারি ২৮২৯

ইমাম বুখারি রহ. এ হাদিসের উপর এ বাব কায়েম করেছেন-

باب التكبير عند الحرب
“যুদ্ধে তাকবির প্রদান সংক্রান্ত বাব।”

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২হি.) এর ব্যাখ্যা বলেন,

أي جوازه أو مشروعيته
“অর্থাৎ তাকবির বৈধ হওয়া ও বিধিসম্মত হওয়ার আলোচনা সংক্রান্ত বাব।” –ফাতহুল বারি ৬/১৩৪

হাদিসে এসেছে, শেষ যামানায় কুস্তনতুনিয়া বিজয় হবে তাকবির ধ্বনির মাধ্যমে। সাহাবায়ে কেরাম থেকেও তাকবির প্রমাণিত।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯হি.) বলেন (সারাখসী রহ. এর ব্যাখ্যাসহ),

ولا يستحب رفع الصوت في الحرب من غير أن يكون ذلك مكروها من وجه الدين. ولكنه فشل، فإن كان فيه تحريض ومنفعة للمسلمين فلا بأس به. يعني أن المبارزين يزدادون نشاطا برفع الصوت، وربما يكون فيه إرهاب للعدو على ما قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «صوت أبي دجانة في الحرب فئة». اهـ
“যুদ্ধের ময়দানে উচ্চস্বরে আওয়াজ করা মুস্তাহাব নয়। অবশ্য শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তা মাকরূহও নয়। তবে তা হীনমন্যতার পরিচায়ক। তবে এর দ্বারা যদি অন্যরা উৎসাহিত হয় বা মুসলিমদের অন্য কোন ফায়েদা হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। অর্থাৎ উচ্চ আওয়াজের ফলে যোদ্ধাদের মধ্যে স্পৃহা তৈয়ার হবে। এর দ্বারা শত্রুদের মনে ভীতিও তৈয়ার হতে পারে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যুদ্ধে আবু দুজানার আওয়াজ মুজাহিদের এক বাহিনির সমতুল্য।”- শরহুস সিয়ারিল কাবির ১/৮৯

আপনি এ ব্যাপারে মিম্বারুত তাওহিদের নিচের ফতোয়াটি দেখতে পারেন-

ما حكم رفع الصوت بالذكر والتكبير في المعارك؟ ... رقم السؤال: 618 السلام عليكم ورحمة الله،، ... هل يستحب في ساحات القتال عندما يحمى الوطيس رفع الصوت بالتكبير والتهليل لإرعاب الأعداء أم أنه يكره ذلك؟ ... لأنني وجدت آثاراً أن السلف كانوا يكرهون رفع الصوت في ثلاث مواضع منها القتال... السائل: أبو الهيثم الأثري المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ... قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون) قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء ... وفي الحديث المرفوع يقول الله تعالى: (إن عبدي كل الذي يذكرني وهو مناجز قرنه) أي لا يشغله ذلك الحال عن ذكري ودعائي واستعانتي .. وعن قتادة في هذه الآية قال: افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون عند الضرب بالسيوف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: وجب الإنصات وذكر الله عند الزحف ثم تلا هذه الآية قلت: يجهرون بالذكر؟ قال: نعم .. فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنوا وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوه بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه ويسألوه النصر على أعدائهم. اهـ[تفسير ابن كثير بتصرف يسير] ... وبوب البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه: "باب التكبير عند الحرب", وأخرج فيه بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم فلما رأوه قالوا هذا محمد والخميس محمد والخميس فلجؤوا إلى الحصن فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: (الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله:"باب التكبير عند الحرب" أي جوازه أو مشروعيته. اهـ[فتح الباري 6\163] ... وروي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة أصوات يباهي الله عز وجل بهن الملائكة: الأذان, والتكبير في سبيل الله, ورفع الصوت بالتلبية) [رواه ابن عساكر] ... وأما مسألة رفع الصوت بالتكبير في القتال فقد رويت في ذلك أحاديث وآثار, وقد جمع بعض أهل العلم شيئاً منها, كالإمام ابن النحاس الدمياطي رحمه الله في "مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق"صفحة 1/ 262 وما بعدها, وأفردها في فصل بعنوان: " فصل في فضل نظر الغازي والمرابط إلى البحر والتكبير في سبيل الله تعالى". ... قال ابن المنذر في كتابه الأوسط: قال أشهب: سألت مالكاً عن رفع الأصوات بالتكبير على الساحل في الرباط بحضرة العدو أو بغير حضرتهم, هل يكره أو يسمع الرجل نفسه؟ فقال: أما بحضرة العدو فلا بأس وذلك حسن, وبغير حضرتهم على الساحل فلا بأس بذلك أيضاً, إلا أن يكون رفعه صوته يؤذي الناس, لا يستطيع أحد أن يقرأ ولا يصلي فلا أرى ذلك. اهـ ... وقال الليث بن سعد: كان من مضى يكبرون في محاربهم يتقوون به على الحرس وسهر الليل, ولم نر أحداً يعيب ذلك حتى كان حديثاً. اهـ ... وقال ابن القاسم: سئل مالك عن القوم يكونون في الرباط يهللون ويكبرون على الساحل ويطربون بأصواتهم. قال: أما التطريب فلا يعجبني, وأما أن يهللون ويكبرون - يريد إذا كان الحرب - فلا أرى بأساً وأراه حسناً. اهـ[مشارع الأشواق 1/ 268] ... ومما يُستأنس به في هذا الباب, ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق فإذا جاؤها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها, ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا ..) قال الشيخ صفي الرحمن المباركفوري: (فيفرج لهم) أي فيكشف لهم ويفر العدو .. وهذا الفتح المذكور في هذا الحديث إنما يحصل بهتاف التكبير دون القتال .. اهـ[منة المنعم في شرح صحيح مسلم 4/ 365] ... فيستحب للمجاهد التكبير وذكر الله في المعارك ورفع الصوت بذلك, لما في ذلك من مقاصد شرعية؛ كتثبيت قلوب المؤمنين, وإرعاب الكافرين والمرتدين, وهذا أمر مجرب معروف, والقصص فيه كثيرة مشهورة, والله أعلم.

أجابه، عضو اللجنة الشرعية: ... الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري

আলী ইবনুল মাদীনী

ইলম ও জিহাদ

ইমাম আবূ দাউদ কিতাবুল জিহাদে একটা অধ্যায় এনেছেন "باب قيام يومر من الصمت عند اللقاء" অর্থাৎ শত্রুর সাথে মোকাবেলার সময় চুপ থাকতে হয় । এই অধ্যায়ের হাদিসের ব্যখ্যা করতে গিয়ে "বজলুল মাজহুদ (আবু দাউদের ব্যাখ্যাকার)" বলেন সাহাবায়ে কেরাম উচ্চস্বরে জিকির করছেন এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

এখন ইনার এই দাবির উত্তর কি হবে?

উনার মূল বক্তব্যটা এমন,

واستثنى القاري منه ذكر الله فقال: بغير ذكر الله، ولم يثبت لي أنهم يرفعون
أصواتهم بذكر الله تعالى عند القتال. اهـ بذل المجهود 268\9

অর্থাৎ মোল্লা আলী কারি বলেছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধের ময়দানে হৈ-হুল্লোর করতেন না, তবে উচ্চস্বরে আল্লাহ তাআলার যিকির করতেন। সাহারানপুরি রহ. বলছেন, আমি এমনটি দেখিনি। কুরআনে কারীমের আয়াত দ্বারা যিকির প্রমাণিত। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারে তাকবির দিয়েছেন। শেষ যামানায় কুস্তুনতুনিয়া বিজয় হবে তাকবিরের দ্বারা। অতএব, তাকবির তাহলিল বৈধ হওয়ার ব্যাপারে বরং উত্তম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই। এখন রইল উচ্চস্বর।

যিকিরের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়ম হলো, আস্তে ধীরে হওয়া। যুদ্ধের ময়দানের বিষয়টাও এমনই। মুজাহিদগণ আস্তে ধীরে নিম্নস্বরে আল্লাহর যিকির করবেন। তবে যেখানে প্রয়োজন সেখানে জোরে হলেও সমস্যা নেই। যেমন, মল্লযুদ্ধ চলছে। তখন কাফের সৈন্যটিকে ভীত করার জন্য এবং মুসলিম মুজাহিদকে উৎসাহ দেয়ার জন্য উচ্চস্বরে তাকবির দিলে সমস্যা নেই। এমনিভাবে অন্য মুসলমানদের উৎসাহিত করার জন্য জোরে তাকবির দিলেও সমস্যা নেই। মোটকথা যেখানে জোরে প্রয়োজন সেখানে জোরে, অন্যথায় আস্তে। বিনা প্রয়োজনে হৈ-হুল্লোর করা সাহাবায়ে কেরাম অপছন্দ করেছেন। নতুবা প্রয়োজনের সময় তো উচ্চস্বরে আওয়াজ সীরাত থেকে স্পষ্ট। হুনাইনের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামকে পুনর্বার একত্রিত করার জন্য আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু জোর গলায় আওয়াজ দিয়ে সকলেকে আহ্বান করেছেন। যু কারাদের যুদ্ধে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু 'ইয়া সাবাহা' বলে চিৎকার দিয়ে মদীনা বাসীকে শত্রুর আক্রমণ অবগত করেছেন। এছাড়াও মুজাহিদ বাহিনির বিভিন্ন শিয়ার ছিল, যেগুলো দিয়ে প্রয়োজন মূহুর্তে তাদের ডাকা হতো। অনেক সময় সাহাবায়ে কেরাম কবিতাও আবৃতি করতেন। জোশ আনার জন্য এমনটা করতেন।

জোরে আওয়াজ অপছন্দ করার আরেকটা কারণ হলো, এতে শত্রুবাহিনি টের পেয়ে যাবে যে মুসলমানরা কোথায় আছে। তবে যখন শত্রু সামনেই বিদ্যমান, কিতাল চলছে তখন এ সমস্যাটি নেই। তবে তখনও অপ্রয়োজনে উচ্চস্বর না করা ভাল। এজন্যই ইমাম মুহাম্মাদ রহ. একে মুস্তাহাব বা ভাল নয় বলেছেন। প্রয়োজন পড়লে সমস্যা নেই বলেছেন।

আর সাহাবায়ে কেরাম জোরে জোরে যিকির করেছেন কি'না যুদ্ধের ময়দানে, এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কিছু কোথাও দেখিনি। কিছু বর্ণনা আছে তবে দুর্বল। হয়তো সাহারানপুরি রহ. এর কথাই সঠিক যে, এ ব্যাপারে তিনি কিছু পাননি। তবে এর দ্বারা প্রয়োজনের সময়ও নাজায়েয প্রমাণিত হয় না, যেমনটা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বা সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জোর গলার ডাক নাজায়েয হয়নি। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

মানবরচিত বিধান

দ্বারা ফয়সালাকারী শাসকদের ব্যাপারে ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনী রহ. এর ফতোয়া

আদনান মারুফ

ইমামুল হারামাইন আব্দুল মালিক বিন আব্দুল্লাহ আবুল মাআলী আলজুওয়াইনী রহ. (মৃত্যু:৪৭৮)। শাফেয়ী মাযহাবের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। সালজুকী সালতানাতের বিখ্যাত উযির নেযামুল মুলক তুসীর প্রতিষ্ঠিত ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম প্রচলিত মাদ্রাসা ‘মাদ্রাসায়ে নেযামিয়া’র প্রধান শিক্ষক। ইমাম আবু ইসহাক সিরাজী তাকে ইমামুল আয়িম্মাহ বা ইমামদের ইমাম বলে সম্বোধন করতেন। শাফেয়ী মাযহাবকে সুবিন্যস্তরুপে পেশ করার ক্ষেত্রে তার অবদান সুস্বীকৃত। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ১৬/৯৬ আলমাদখাল ইলা দিরাসাতিল মাযাহিবিল ফিকহিয়্যাহ, পৃ: ৪১)

তাঁর যুগে মানুষের মাঝে একটা ভুল ধারণা ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই মনে করতে থাকে, শরিয়তের নির্ধারিত শাস্তি মানুষকে অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট না, তাই অন্যায়ের শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ইমামুল হারামাইন তাদের এই ধারণার তীব্র সমালোচনা করেন, অত্যন্ত জোরালোভাষায় তা খন্ডন করেন। এমনকি একপর্যায়ে তিনি বলেন,

وما أقرب هذا المسلكَ مِن عَقْدِ من يَتَّخِذُ سُنَنَ الأكاسرة والملوك المُنقرِضين عمدةَ الدين، ومن تشبَّث بهذا، فقد انسلَّ عن رِبقة الدين انسلالَ الشعرة عن العجين. (غياث الأمم في التياث الظلم، الناشر: مكتبة إمام الحرمين، الطبعة: الثانية، 1401هـ)۔

“এই মতবাদটা ঐ লোকদের কাজের কতই না নিকটবর্তী যারা পূর্ববর্তী কায়সার ও অন্যান্য বাদশাদের রীতিনীতি ও আইনকানুনকে দ্বীনের ভিত্তি রুপে গ্রহণ করে। আর যে এরুপ করবে সে তো দ্বীনের গন্ডি থেকেই বের হয়ে যাবে, যেমনিভাবে খামিরা থেকে চুল বের হয়।” (অর্থাৎ যেমনিভাবে খামিরা থেকে বের করা চুলের মাঝে আটার কোন অংশ লেগে থাকে না, তেমনিভাবে তার মাঝেও দ্বীনের কোন অংশ থাকবে না, সে কাফের-মুরতাদ হয়ে যাবে।) -গিয়াসুল উমাম, পৃ: ২২২ আরো দেখুন, পৃ: ২০০

শায়েখ আব্দুর রহমান বিন সালেহ আলমাহমুদ ইমামুল হারামাইনের বক্তব্য উদ্ধৃত করে এর টীকায় লিখেন,

وما أشبه كلام الجويني هذا بالقوانيين الوضعية التي انتشرت بين المسلمين، فإنها شرائع وقوانيين الغرب الكافر من نصارى وغيرهم، وقد حكم الجويني على من يتخذ سنن الأكاسرة مرجعا وعمدة في الدين بالكفر والخروج من الدين. (الحكم بغير ما أنزل الله : أحواله وأحكامه ص 271)۔

“ইমাম জুওয়াইনীর বক্তব্য মুসলমানদের মাঝে বিস্তার লাভ করা মানবরচিত বিধানের সাথে কতইনা মিলে যায়। কেননা এগুলো পশ্চিমা খৃষ্টান ও অন্যান্য কাফেরদের বিধান, রীতিনীতি ও আইনকানুন। আর যে কায়সারদের রীতিনীতি ও আইনকানুনকে দ্বীনের ভিত্তি বানায় ইমাম জুওয়াইনীর বক্তব্য অনুযায়ী সে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়।” -আলহুকমু বিগাইরি মা আনযালাল্লাহ ,পৃ: ২৭১

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে

ইলম ও জিহাদ

সাত. চোর

চোরের স্বাভাবিক শাস্তি হল প্রথমবারে চুরি করলে ডান হাত কেটে দেয়া, দ্বিতীয়বারে বাম পা কেটে দেয়া। হাত কাটা কুরআনে কারীম দ্বারা আর পা কাটা সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। (ফাতহুল কাদির ৫/৩৯৭-৩৯৮)

তৃতীয় ও চতুর্থবারে চুরি করলে কি করা হবে তা মতভেদপূর্ণ। কোনো কোনো জয়িফ হাদিসে তৃতীয়বারে বাম হাত এবং চতুর্থবারে ডান পা কেটে দেয়ার কথা এসেছে এবং পঞ্চমবারে হত্যা করে দেয়ার কথা এসেছে। তবে হাদিস নিতান্তই দুর্বল। সাহাবায়ে কেরাম থেকে এর বিপরীত আমল প্রমাণিত আছে।

যেমন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে প্রমাণিত যে, দুইবারের বেশি চুরি করলে হাত-পা না কেটে বা হত্যা না করে জেলে ভরে রেখেছেন। এ কারণে হানাফিদের মত হলো, দুইবারের বেশি চুরি করলে জেলে ভরে রাখা হবে এবং শাস্তি দেয়া হবে। তাওবা করে ভাল হলে তো ভালোই অন্যথায় মরণ পর্যন্ত জেলেই থাকতে হবে। তবে ইমামুল মুসলিমিন বা কাযি সাহেব যদি মুনাসিব মনে করেন তাহলে ফাসাদ ফিল আরদের কারণে তৃতীয়-চতুর্থবারে হাত পা কাটতে পারবেন বা হত্যা করতে পারবেন। তবে প্রথম বা দ্বিতীয়বারে হত্যা করতে পারবেন না। কারণ, দুইবারের শাস্তি শরীয়তে সুনির্ধারিত।

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১হি.) বলেন,

فامتناع علي بعد ذلك إما لضعف الروايات المذكورة في الإتيان على أربعته وإما لعلمه أن ذلك ليس حدا مستمرا بل من رأى الإمام قتله لما شاهد فيه من السعي بالفساد في الأرض وبعد الطباع عن الرجوع فله قتله سياسة فيفعل ذلك القتل المعنوي. اهـ

"হাদিস বর্ণিত হওয়ার পরও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উপর আমল করেননি। হয়তো এ কারণে যে, চারো হাত-পা কেটে দেয়ার উপরোক্ত বর্ণনাগুলো দুর্বল; নয়তো এ কারণে যে, তিনি জানেন, তা শরীয়ত নির্ধারিত হদ হিসেবে নয়, বরং ইমামের রায় হিসেবে। দেখলেন যে, এ লোক ফাসাদ ফিল আরদ করে বেড়াচ্ছে এবং তা থেকে ফিরে আসার মতো মানসিকতা তার নেই। এমতাবস্থায় তাকে হত্যা করা জায়েয। তাই হাত-পা কেটে দিতে পারেন, যা হত্যারই নামান্তর।" –ফাতহুল কাদির ৫/৩৯৭

ইবনে আবিদিন রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

وفي حاشية السيد أبي السعود: رأيت بخط الحموي عن السراجية ما نصه: إذا سرق ثالثا ورابعا للإمام أن يقتله سياسة لسعيه في الأرض بالفساد. اهـ قال الحموي: فما يقع من حكام زماننا من قتله أول مرة زاعمين أن ذلك سياسة جور وظلم وجهل. اهـ

"সায়্যিদ আবুস সাউদ রহ. তার প্রণীত হাশিয়াতে বলেন, হামাবি রহ. এর নিজ হাতের লেখা দেখেছি যে, (ফাতাওয়া) সিরাজিয়া থেকে নিম্নোক্ত কথাটি বর্ণনা করেছেন: 'তৃতীয় ও চতুর্থবারে চুরি করলে যমিনে ফাসাদ করে বেড়ানোর অপরাধে সিয়াসতরূপে ইমামুল মুসলিমিন তাকে হত্যা করতে পারবেন'। হামাবি রহ. বলেন, সিয়াসতের দাবি তুলে আমাদের বর্তমান যামানায় প্রথমবারেই যে হত্যা করে দেয়া হচ্ছে তা অন্যায়-অবিচার, জুলুম ও অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়।" –রদ্দুল মুহতার ৪/১০৩

অতএব, প্রথম বা দ্বিতীয়বারে হত্যা করা যাবে না। তৃতীয়-চতুর্থবারে জেলে ভরে রাখবে। তবে একান্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোক হলে এবং তাকে হত্যা করে দেয়াই সমাজের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হলে হত্যা করতে পারবেন।

DAWAHILALLAH

প্রথমআলো-ডেইলি স্টার আপনাকে শেখাবে ক্ষমতাসীন আর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দৃষ্টিতে বর্তমানকে দেখতে। বিবিসি, সিএনএন, ভয়েস অফ অ্যামেরিকা আপনাকে শেখাবে পশ্চিমা কাফিরদের দৃষ্টিতে বর্তমানকে বিচার করতে। আর আমরা আপনাকে জানাব আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপট আর সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান। তাই আমাদের সাথেই থাকুন, ইসলামের দৃষ্টিতে বাস্তবতাকে দেখতে নিয়মিত ভিজিট করুন।

https://dawahilallah.com
https://alfirdaws.org
http://gazwah.net